বাবর নামায় ভারত কথা

শচীন্দ্রলাল রায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৭৫

প্রচ্ছদপট অঙ্কন—

রণেন মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি, এম লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী, কলি-৬ হইতে প্রকাশিত, ও শ্রীগৌর চন্দ্র ভক্ত কর্তৃক মুদ্রণ ইনডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫৪, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বীণা ও বুলুকে

—বড়দাদা—

এই লেখকের লেখা

জহর ও অমৃত

নেশার ঘোরে

দাবী দাওয়া

গোয়ে।

রক্তের সম্বন্ধ

কমল বন

বাবরের আত্মকথা

জাহাঙ্গীব নামা (যন্ত্রস্থ

ভূমিকা

জহিরউদ্দিন বাবর নিঃসন্দেহে তাঁর সমকালের একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। এসিয়া মহাদেশে নানা রাজ্যের সিংহাসন যাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধানতম সম্পদশালী এবং প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজ্যে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্টাতার চরিত্রে রাজনীতিবেত্তা ও অধিনায়কত্বের মহান গুণ একত্রে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বাবর এই উভয়ক্ষেত্রেই আদর্শ স্থানীয় বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন।

যদি এসিয়া মহাদেশের ইতিহাস পক্ষপাতহীন ভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে এমন কোনও রাজপুরুষের সন্ধান মিলবে না যিনি বাবরের অপেক্ষা যোগ্যতায় উচ্চশ্রেণীর বলে গণ্য হতে পারেন। চেন্‌গিজ খাঁ ও তাইমুরের শক্তি তাঁদের জাঁক জমকপূর্ণ দেশ জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য সেই দেশজয় বাবরের দেশজয় অপেক্ষা বেশী চমকপ্রদ। কিন্তু তাঁর মত উচ্চাঙ্গের মননশীলতা, সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যে অচঞ্চল মানসিকতা ও ধৈর্য্য, সদা প্রফুল্ল মনোভাব, পুরুষোচিত গুণাবলী, জ্ঞানার্জ্জনের দিকে আগ্রহ, বিদ্যাচর্চ্চা, সঙ্গীতানুরাগ উদ্যান রচনায় উৎসাহ ইত্যাদি গুণ একাধারে এসিয়া মহাদেশের অন্য কোনও রাজ পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না।

বাবর তাঁর আত্মচরিত লিখেছিলেন তুর্কি ভাষায়। এর অনুবাদ হয় ফারসি ভাষায়। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই অদ্ভুত আত্মচরিতের অনুবাদ হয়েছে।'

পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত বাবরনামার বঙ্গানুবাদ 'বাবরের আত্মকথা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পানিপথের যুদ্ধের পর থেকে 'বাবরনামার' অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। সত্যই এটি তাঁর ভারত কথা। কিরূপ পর্যাবেক্ষণ শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন এই গ্রন্থে তার প্রমান পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানের দোষগুণ তিনি নিজে উপলব্ধি করে তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর নিজের দোষগুণ ও অকপটে ব্যক্ত-

করেছেন। তিনি মদ্যপ ছিলেন। আল্লার নামে শফৎ নিয়ে তিনি সুরাপান ত্যাগ করেছিলেন। মাঝে মাঝে মদ্য পানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতো তিনি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অদম্য মনের জোরে তিনি নিজেকে দমন করে রাখতে পেরেছিলেন।

তিনি ছিলেন উদ্যান রসিক। ভারত জয়ের পর নানাস্থানে তিনি উদ্যান রচনা করেছিলেন। নতুন গাছ তিনি আনিয়েছিলেন ভারতের বাইরে থেকে। তিনি আঙ্গুর ও খরমুজের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন তাঁর উদ্যানে। তারপর থেকেই এই ফল ভারতে উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতবাসী তার ফল ভোগ করছে।

বাবর জীবন পঞ্জী

১৪৮৩—১৪ই ফেব্রুয়ারি—বাবরের জন্ম।

১৪৮৮—পাঁচবৎসর বয়সে সমরকন্দে গমন। সুলতান আমেদ (আলাচা) খাঁয়ের কন্যা আয়েষার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির।

১৪৯৪—জুন—পিতা ওমর সেখ মির্জ্জার মৃত্যুর পর ফারগাণার রাজ সিংহাসন লাভ।

১৪৯৫—আমেদ মির্জ্জার হাত থেকে আসফারা ও খুজেন্দ পুনরুদ্ধার।

১৪৯৭—মে—সমরকন্দের বিরুদ্ধে অভিযান।—নভেম্বর—সমরকন্দ অধিকার। ১০০ দিন সমরকন্দ বাসের পর তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তামবল কর্ত্তৃক অধিকৃত ফারগাণা পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা। খুজেন্দ ভিন্ন আর সমস্ত স্থান অধিকার চ্যুত। আইলাকের মেষ পালকদের মধ্যে ঘোরা।

১৪৯৮—আলিদোস্তের বাবরকে মার্ঘিনান প্রত্যর্পন।

১৪৯৯—জুন—বাবরের ফারগাণা উদ্ধার। আয়েষার সঙ্গে বিবাহ।

১৫০০—বাবরকে সন্ধিচুক্তিতে সাক্ষর করতে বাধ্য করে ফারগাণা বিভাগ ও ভ্রাতা জাহাঙ্গির মির্জ্জার অংশ লাভ।

১৫০০—জুন—তারখান পরিবারের সমরকন্দ পুনরুদ্ধারের জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ। উজবেগ নেতা সেবানির বাধা দান।

১৫০০—নভেম্বর—উজবেগদের পরাজিত করে সমরকন্দ জয়।

১৫০১—মে—সের-ই-পুলের যুদ্ধে সেবানি কর্ত্তৃক বাবরের পরাজয়।

১৫০১—জুলাই—বাবরের প্রথম সন্তান-কন্যার সমরকন্দে জন্ম ও এক মাস পর মৃত্যু।

১৫০১—মে—নভেম্বর—সমরকন্দ দুর্গ সেবানি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ।

১৫০১—ডিসেম্বর—বাবরের সমরকন্দ দুর্গত্যাগ।

১৫০২—জানুয়ারি-মে—গৃহহারা বাবরের কয়েকজন অনুচর সহ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমন।

১৫০২—জুন—তাসকেন্দে মাতুল মহম্মদ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ। সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা।

১৫০২—জুলাই—খানদের সাহচর্য্যে আন্দেজানে তাম্বলকে আক্রমণ। উশ উজকেন্দ এবং মাৰ্ঘিনান জয় করে বড় খাঁয়ের ছোট ভাইকে দান। তামবলের ভাই বেজিদের বাবরকে আখ্‌সিতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ।

৫০১৩—জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি—খান ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক বাবর পরিত্যক্ত এবং তাম্বল কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আন্দেজানে খানদের নিকট পলায়ন।

১৫০০—জুন—আখসিতে সেবানি কর্ত্তৃক খানদের পরাজয়। বাবরের ফারগাণার দক্ষিণে পাহাড়ে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন।

১৫০৪—জুন—বাবরের ভাই জাহাঙ্গির ও নাসির, তাঁর মা ও অন্যান্য পরিজন-দের সঙ্গে খোরাসানের পথে যাত্রা—পথ পরিবর্ত্তন—কাবুলের উদ্দেশ্যে গমন।

১৫০৪—অক্টোবর—কাবুল অধিকার।

১৫০৫—জানুয়ারি—মে—খাইবার গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করে কোহাট অভিযান। সিন্ধুনদ তটে আগমন—গজনি অধিকার। আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযান।

১৫০৬—জুন—স-সৈন্য কাবুল ত্যাগ করে হিরাটের সুলতান হোসেনকে সাহায্যের জন্য সেবানি উজবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা।

১৫০৬—অক্টোবর—৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে সুলতান হোসেনের পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—খোরাসানের রাজধানী হিরাটে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান।

১৫০৬—২৪শে ডিসেম্বর—হিরাট ত্যাগকরে কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা—বরফের ভিতর দিয়ে বিভীষিকা ময় পথ চলা।

১৫০৭—কাবুলে উপস্থিতি—সাবেগ ও মুকিমের হাত থেকে কান্দাহার উদ্ধার। কাবুলে মোগল বিদ্রোহ।

১৫০৭—১৫১০—কাবুলে উপস্থিতি ও শাসন পরিচালনায় ব্যস্ত—খান মিজ্জর পত্র প্রাপ্তি—পারশ্যের সাফাইদ শাসকের সাহায্যে সমরকন্দ জয়ের সঙ্কল্প।

১৫১১— উজবেগদের সঙ্গে যুদ্ধ।

১৫১১—অক্টোবর—পুনরায় সমরকন্দের রাজসিংহাসন লাভ।

১৫১২—মে— শেষবারের মত সমরকন্দ ত্যাগ।

১৫১২—নভেম্বর—গজ্‌দিভানে উজবেগদের সঙ্গে যুদ্ধ—বাবরের পরাজয়—হিসারে পলায়ন—কুন্দজে আশ্রয় গ্রহণ।

১৫১৩ অথবা ১৫১৪ (প্রথমদিকে)—কাবুলে প্রত্যাবর্তন।

১৫১৯— ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান—বাজুর দুর্গ জয়।

১৫১৯—১৫২৬—পাঁচবার ভারত আক্রমণ—কাবুল রাজ্য সংগঠন—গজনির মোগল বিদ্রোহ দমন—সোয়াৎ ও বাজুর জয়।

১৫১৯—১৭ই ফেব্রুয়ারি—সিন্ধুনদ অতিক্রম—ভিরা এবং ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যবর্তী দেশের বশ্যতা লাভ—কাবুলে ফেরার পথে গক্‌কর-দের প্রধান সহর অধিকার।

১৫২০— হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান—গক্‌কর উপজাতিদের আক্রমণ—ভিরার বিদ্রোহ দমন—শিয়ালকোটে উপস্থিতি—পরলোক গত খান মির্জার স্থলে হুমায়ুনকে বাদাকসানের শাসক নিযুক্ত।

১৫২২— শা' বেগের বাবরকে কান্দাহার সমর্পণ।

১৫২৪— ভারতে চতুর্থ অভিযান—লাহোর ও পাঞ্জাবের অধিকার লাভ।

১৫২৫— জ্বর ও রক্তামাশায় পীড়িত।

১৫২৫—নভেম্বর—ভারতে পঞ্চম অভিযান—পাঞ্জাবে শান্তি রক্ষা—দিল্লী অভিমুখে যাত্রা।

১৫২৬—২১ শে এপ্রিল—পাণিপথের যুদ্ধ—ইব্রাহিম লোদির পরাজয়—দিল্লী ও আগ্রা অধিকার।

১৫২৭—১৬ই মার্চ—খানুয়ার যুদ্ধ—রাণা সঙ্গের পরাজয়—গাজি পদবী গ্রহণ।

১৫২৮—২০ শে জানুয়ারি—চান্দেরি দুর্গ জয়।

১৫২৮-১৫৩০—হিন্দুস্থানে শান্তি স্থাপন—উত্তর ভারতের বশ্যতা।

১৫৩০—২৮ শে ডিসেম্বর—আগ্রায় বাবরের মৃত্যু।

বাবর নামায় ভারত কথা

[বাবর ১৫১৯-২৬ সালের মধ্যে পাঁচবার ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ সাল ২১ শে এপ্রিল তিনি পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। পাণি পথের যুদ্ধে জয়লাভই ভারত জয়ের সূচনা। বাবরের আত্মকথায় এই অভিযানের বিশদ বর্ণনা আছে। জয়লাভের পর তাঁর

আত্ম কথায় লিখেছেন—'দৈব অনুগ্রহের ওপর আমার অকুণ্ঠ নির্ভরতার জন্য সর্ব্বশক্তিমান মহান আল্লা আমাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখেন নি। তাঁরই কৃপায় আমি পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে এই বিশাল হিন্দুস্থান জয় করার গৌরব লাভ করেছি। এই কৃতকার্য্যতা আমার নিজ শক্তিতে হয়েছে কিংবা আমার এই সৌভাগ্য আমার নিজের চেষ্টায় লাভ করেছি এরূপ আমি কখনই মনে করি না। আল্লার অপার করুণা ও অনুগ্রহের জন্যই এই গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করেছি।'

নিজেকে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমতালে তার ভারতকথা। লেখা চলেছে। পাণিপথের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার পরই তাঁর আত্মকথায় হিন্দুস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে 'বাবরনামায় ভারত কথার' সূচনা এখান থেকেই।]

হিন্দুস্থানের বিবরণ

হিন্দুস্থান একটি ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী বিশাল দেশ। পূর্ব্ব, দক্ষিণ • এমন কি পশ্চিমদিকেও ঘিরে আছে সমূদ্র। উত্তরে সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী যা হিন্দুকুশ, কাফেরিস্থান ও কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল, গজনি ও কান্দাহার। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। সাহাবুদ্দিন ঘোরির মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ সার রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত (১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দুস্থানের অধিকাংশই দিল্লীর সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল।

আমার হিন্দুস্থান জয়ের সময় এই দেশ পাঁচজন মুসলমান বাদশাহের এবং দুইজন বিধর্ম্মীর শাসনাধীন ছিল। তাঁরা সকলেই স্বাধীন শাসক বলে বিখ্যাত ছিলেন। পার্ব্বত্য ও অরণ্য প্রদেশগুলিতে আরও অনেক রহিস্ ও রাজা ছিলেন, তবে তাঁদের বিশেষ কোনও খ্যাতি ছিল না।

(১) ভারতের রাজধানী দিল্লী আফগান সুলতানের দখলে ছিল। তাঁরা ভিরা থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশ শাসন করতেন। তাঁদের রাজত্বের পূর্ব্বে জৌনপুর সুলতান হোসেন সারকির অধীন ছিল। তাঁদের বংশকে হিন্দুস্থানে 'পুরবী' বংশ বলা হতো। তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষরা সুলতান ফিরোজ সা এবং তুঘলক সুলতানদের পেয়ালা বরদার ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তারা জেনিপুরে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ওঠে। সেই সময় সৈয়দ বংশের সুলতাম আলাউদ্দিন (ওরফে আলম খাঁ) দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী অধিকার করার পর তাইমুর বেগ আলাউদ্দিনের পূর্ব্ব পুরুষের হাতে দিল্লী সমর্পণ করে চলে যান। সুলতান

ভুলাল লোদি এবং তাঁর পুত্র সেকেন্দার জৌনপুর রাজধানী ও দিল্লী রাজধানী অধিকার করার পর এই দুইটাকে একত্রিত করে একই রাজ্যরূপে শাসন করতে থাকেন (১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

(২) সুলতান মহম্মদ মুজাফফর গুজরাটের শাসক ছিলেন। সুলতান ইব্রাহিমের পরাজয়ের কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। তিনি আইনজ্ঞ এবং জ্ঞানান্বেষী ছিলেন এবং অনবরত কোরাণ নকল করতেন। তাঁর বংশকে এখানকার জনসাধারণ 'তঙ্ক' নামে অভিহিত করতো। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরাও সুলতান ফিরোজ সা এবং অন্যান্য তুঘলক সুলতানদের সুরা পরিবেশকরূপে কাজ করতো। ফিরোজ খাঁর মৃত্যুর পর তারা গুজরাট অধিকার করে।

(৩) দাক্ষিণাত্যে বাহমণি সাম্রাজ্য। কিন্তু সেখানে এখন কোনও স্বাধীন রাজা ছিল না। তাদের পরাক্রমশালী বেগরা এই দেশের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে যে যার পছন্দমত টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছে।

(৪) মালওয়া প্রদেশের রাজা ছিলেন সুলতান মামুদ। এখানকার লোকেরা এ দেশকে মাণ্ডুও বলতো। তাঁর বংশকে বলা হয় খিলিজি (তুর্ক)। রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত করে' তাঁর রাজ্যের বেশীরভাগই অধিকার করে নেন। খিলিজি বংশও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মামুদের পূর্ব্বপুরুষরাও নিশ্চয় ফিরোজ শার অধীনে কাজ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর তারা মালওয়া অধিকার করে।

(৫) নসরৎ সা এই সময়ে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতাও বাংলার রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দিন। বাংলা দেশের একটি বিশেষ রীতি এই যে, রাজসিংহাসন অধিকার করাটা উত্তরাধিকারত্বের উপর খুব কমই নির্ভর করে। রাজার জন্য অবশ্য একটি রাজসিংহাসন স্থির আছে। অনুরূপভাবে এক একজন আমিরের জন্যও পৃথক পৃথক আসন ও পদ নির্দ্ধারিত থাকে। এই রাজসিংহাসন এবং পদগুলিই বাংলার জনসাধারণের ভক্তি ও আনুগত্য আকর্ষণ করে। এইসব পদাধিকারীদের জন্য একদল অনুগত অনুচর, ভৃত্য এবং কর্ম্মচারীর গোষ্ঠি নির্দ্দিষ্ট থাকে। রাজা এই সব পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে বরখাস্ত এবং তার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলে তার স্থলাধিষ্ঠিত ব্যক্তিই এইসব ভৃত্য পরিচালকদের আনুগত্য লাভ করে। শুধু তাই নয় এই নিয়ম রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতিও প্রযুক্ত

হয়। যদি কোনও রাজাকে হত্যা করে কেউ রাজসিংহাসনে বসতে সফলকাম হয় তাহলে তাকে সকলেই তৎক্ষণাৎ রাজা বলে মেনে নেয়। সমস্ত আমির, মন্ত্রী, সৈন্য, প্রজাসাধারণ সঙ্গে সঙ্গেই তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকেই পূর্ব্বাধিকারীর স্থলাভিষিক্ত বলে স্বীকার করে এবং সর্বপ্রকারে তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে তার আদেশ অকুণ্ঠভাবে পালন করতে উৎসুক হয়। বাংলার অধিবাসীরা বলে থাকে—আমরা রাজসিংহাসনের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বাসী। যে কেউ সিংহাসনে বসবেন আমরা তাঁরই অনুগত ও বাধ্য থাকবো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে নসরৎ সার পিতার বাংলার রাজতক্তে বসবার আগে একজন আবিসিনীয়াবাসী পূর্ব্বতন রাজাকে হত্যা করে নিজে বাংলার রাজ সিংহাসন অধিকার করে এবং কিছু সময় এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করে। সুলতান আলাউদ্দিন এই আবিসিনীয়াবাসীকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং তাঁকেই বাংলার অধীশ্বর বলে জনসাধারণ স্বীকার করে নেয়। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই সিংহাসন লাভ করেছে এবং এখনও রাজত্ব করছে।

বঙ্গদেশে আর ত্রকটি চলতি প্রথা আছে। এখানে কোনও রাজা যদি পূর্ব্বাধিকারীর সঞ্চিত ধনসম্পদ খরচ করে নিঃশেষ করে ফেলে কিংবা মজুদ অর্থ কমিয়েও ফেলে, তাহ'লে সেটা তার ঘৃণ্য নীচ কাজ বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক রাজারই সিংহাসন অধিকার করার পর তার নিজের আমলে পৃথকভাবে ধন সঞ্চয় করতে হয়। এইভাবে ধনসম্পদবৃদ্ধি করা রাজার পক্ষে অতীব সম্মানজনক এবং মহিমা-ব্যঞ্জক কার্য্য বলে এখানকার জনসাধারণ মনে করে।

আর একটি প্রথাও এখানে চলিত আছে। পুরাকাল থেকেই এই নিয়ম বলবৎ যে প্রত্যেক বিভাগ—যেমন কোষাগার, আস্তাবল এবং রাজকীয় অন্যান্য দপ্তরের খরচ নির্ব্বাহের জন্য আলাদা আলাদা জেলা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট জেলার আয় থেকে এই সব দপ্তরের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হয়, অন্য কোনও তহবিল থেকে করবার নিয়ম নাই।

উপরে উল্লিখিত পাঁচজন মুসলমান রাজা হিন্দুস্থানে বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাঁরা বহু সৈন্য এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। বিধর্ম্মী রাজাদের মধ্যে বিজয় নগরের রাজা—তাঁর রাজ্যের আয়তন এবং সৈন্য-সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সব চেয়ে বড়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রাণা সঙ্গ—যিনি তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে নিজের শৌর্য্য

বীর্য্য এবং তরবারির জোরে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের দেশ চিতোর। মাণ্ডু সুলতানদের অধঃপতনের সময় তাদের অনেক অধীনস্থ প্রদেশ যেমন রন্তম্ভার, সারংপুর, ভিলসান এবং চান্দেরি রাণাসঙ্গ অধিকার করে নেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আমি চান্দেরি বিধ্বস্ত করি এবং আল্লার দয়ায় কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেই অধিকার করে নিই। রাণা সঙ্গের বিশ্বস্ত এবং ক্ষমতাবান অনুচর মেদিনী রায় এখানকার শাসক ছিল। এখানেই আমরা বিধর্ম্মীদের হত্যালীলায় মেতে উঠি। সে সম্বন্ধে পরে বলা হবে। যে স্থান বিধর্ম্মীদের সঙ্গে শত্রুতার ক্ষেত্র ছিল সেই জায়গায় ইসলাম ধর্ম্মের ইমারত গড়ে ওঠে।

বিশাল হিন্দুস্থানে বিভিন্ন জায়গায় অনেক রহিস ব্যক্তি ও রাজা আছে। তাদের কেউ কেউ মুসলমান শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় অথবা তাদের দেশ সুরক্ষিত হওয়ায় মুসলমান আধিপত্য স্বীকার করতে চায় না।

হিন্দুস্থানে ঋতু একটি-দুইটি-তিনটি। চতুর্থ বলতে আর কিছু নাই। এই দেশটা অদ্ভুত। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ দেশ সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হয়। এর পর্ব্বত, নদী, বন, মরুভূমি, এর নগর, শস্যক্ষেত্র, এর পশুপক্ষী, গাছপালা, এর অধিবাসী আর তাদের ভাষা, এর বৃষ্টি এবং আবহাওয়া সবই ভিন্ন রকমের। কাবুলের অধীনস্থ কয়েকটি গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের সঙ্গে এখানকার কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে, কিন্তু অন্য সব দেশের সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। একবার সিন্ধু নদ পার হয়ে এপারে এলেই দেখা যাবে এখানকার মাটি, জল, গাছ, পাহাড়, জনসমাজ, যাযাবর—সকলেরই মরজি আর রীতিনীতি হিন্দুস্থানের পন্থানুযায়ীই চলেছে।

সিন্ধু নদ পূব দিক থেকে পার হয়ে আসার পর উত্তরের পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দেশ দেখা যায়। এই দেশগুলি কাশ্মীরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন যদিও এদের মধ্যে অনেকগুলি—যেমন পাক্‌লি এবং সামাং কাশ্মীরের আধিপত্য মানে না। কাশ্মীরের বাহিরে অগণিত লোক, যাযাবর জাতি, পরগণা ও কৃষি-ক্ষেত্র আছে এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে। বঙ্গদেশেই হোক কিংবা মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্তই হোক, কোথায়ও অগণিত জনসংখ্যার বিরাম নাই। এই মানবগোষ্ঠির চলমান মিছিলের মধ্যে কেউই আমাদের অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে পারে নাই কারা এইসব পর্ব্বতে বাস করে। এইটুকু মাত্র বলে যে এই পাহাড়িয়াদের 'কাছ' বলা হয়। এটা আমি লক্ষ্য করেছি

যে হিন্দুস্থানীরা 'শ' কে 'ছ' বলে উচ্চারণ করে। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কাশ্মীর একটি সম্ভ্রান্ত জনপদ, অন্য কোনও নাম ওরা শোনেনি। হয়তো হিন্দুস্থানীরা সব জায়গাকেই 'কাছ্‌মির' বলে থাকে এবং সেই জন্য এই সব পার্ব্বত্য জাতিদের 'কাছ' বলে অভিহিত করে। পাহাড়ী লোকেরা কস্তুরি, জাফরাণ, সীসা ও তামার ব্যবসা করে।

হিন্দুরা এই পর্ব্বত শ্রেণীকে 'সোওয়ালাখ' (শিবালক) পর্ব্বত বলে। হিন্দুর ভাষায় সোওয়ালাখ অর্থ এক লাখ ও তার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১,২৫,০০০। সুতরাং এখানকার একলাখ পঁচিশ হাজার পাহাড় নিয়ে 'সোওয়ালাখ' পর্ব্বত বলা হয়েছে এটা অনুমান করা চলে। এইসব পর্ব্বতে তুষার গলে না—অবিকৃত থাকে। দূর—যেমন লাহোর, সিরহিন্দ ও সম্বল থেকে পর্ব্বতের শুভ্র তুষার দৃষ্টি গোচর হয়। কাবুলের দিকের পর্ব্বত শ্রেণীকে হিন্দুকুশ বলা হয় যা কাবুল থেকে পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে একটু বেঁকে হিন্দুস্থানে এসেছে। হিন্দুস্থানের দেশগুলি এর দক্ষিণ দিকে। তিব্বত এই পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে। তিব্বতের অজ্ঞাত জাতিকেও 'কাছ' বলা হয়।

এই সব পর্ব্বত হিন্দুস্থানের অনেক নদীর উৎস স্থল। পর্ব্বত থেকে নেমে এসে হিন্দুস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সিরহিন্দের উত্তর দিক থেকে ছয়টি নদীর উৎপত্তি হয়েছে—যথা সিন্ধু, বহত (ঝিলাম), চেনাব, রাবি, বিহাঁ এবং শতদ্রু। এই কয়টি নদীই মূলতানে এসে মিলেছে, তারপর সিন্ধু এই একক নামে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে নানা দেশের মধ্য দিয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে।

এই ছয়টি নদী ছাড়াও আরও নদী আছে—যেমন যমুনা, গঙ্গা, রহবা (রাপ্তি), গোমতি, গগর, সিরু, গণ্ডক এবং আরও অনেক। এই সমস্ত নদীই গঙ্গায় এসে মিশেছে, তারপর এই নামে পূর্ব দিকে এগিয়ে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে। এই সব নদীর উৎপত্তিস্থল 'সোওয়ালাখ' (শিবালক)।

হিন্দুকুশ পর্ব্বত থেকেও অনেক নদীর উৎপত্তি—যেমন চম্বল, বনাস, বিতাই এবং সোন। এই সব পর্ব্বতে বরফ নাই। এই নদী গুলো গঙ্গায় এসে মিশেছে।

হিন্দুস্থানের আর একটি পর্ব্বত শ্রেণী আরাবল্লী পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে বরাবর গিয়েছে। দিল্লী প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের আকারে এর আরম্ভ। এই

পাহাড়ের উপর ফিরোজ সার প্রাসাদ ছিল—নাম 'জাহান-নামা'। এখান থেকে দিল্লীর কাছ পর্য্যন্ত দেখা যায় এখানে ওখানে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত নীচু নীচু পাহাড়। মিওয়াৎ ছাড়িয়ে এই পাহাড় শ্রেণী বিয়ানা প্রদেশে প্রবেশ করেছে। শিক্রি, বারি, দুলপুর পাহাড়গুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। গোয়ালিয়রের পাহাড়গুলি যদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না তবে বাস্তবিক পক্ষে ওগুলি ঐ শ্রেণীরই প্রশাখা। এই রকম প্রশাখা হচ্ছে রন্তম্ভার, চিতোর, চান্দেরি এবং মাণ্ডুর পাহাড়গুলি। কোনও কোনও জায়গায় মূল শাখা থেকে এগুলি সাত আট ক্রোশ তফাৎ। পাহাড়গুলি খুবই নীচু, কর্কশ, পাথুরে এবং জঙ্গলে ভর্ত্তি। এখানে কখনই তুষারপাত হয় না। হিন্দুস্থানের অনেক নদীর জনক এই পাহাড়গুলি।

সেচের ব্যবস্থা—হিন্দুস্থানের বেশীর ভাগ অংশই সমতল ভূমি। যদিও এখানে অনেক জনপদ এবং কৃষিক্ষেত্র আছে—কিন্তু সেচের জন্য কোনও খাল নাই। নদী এবং কোনও কোনও জায়গায় বদ্ধ জলাশয়ের ওপর সেচ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এমন অনেক সহর আছে যেখানে খাল কেটে জল আনা যায় অনায়াসে, কিন্তু সে রকম কোনও ব্যবস্থা করা হয় না। এইভাবে সেচ ব্যবস্থা না করার হয়তো অনেক অর্থ আছে—একটা বোধ হয় এই যে শস্য চাষ অথবা উদ্যান রচনার জন্য এখানে সেচের জলের প্রয়োজন হয় না। হেমন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জলেই জন্মে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বসন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জল না পেলেও হয়ে থাকে। ছোট ছোট চারা গাছে বালতিতে কিংবা চরকি কলে জল দেওয়া হয়। দুই তিন বছর চারা গাছগুলিতে প্রতিদিনই জল দিতে হয়—তারপর অবশ্য আর প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সবজি গাছে অনবরত জল সিঞ্চন দরকার।

লাহোর, দিবলপুর এবং কাছাকাছি জয়গায় কৃষকরা চাকার সাহায্যে ক্ষেতে জল দেয়। তারা দড়ি দিয়ে দুইটি বৃত্ত তৈয়ারী করে কূপের গভীরতার মাপে। এই বৃত্ত দুইটির মাঝখানে কাষ্ঠ খণ্ড ফেলে তার ওপর জল তোলার কলসী শক্ত করে বাঁধে। কুয়োর চাকার ওপর দড়িগুলো সমেত কলসী বাঁধা কাঠ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই চাকার অক্ষের একদিকে দ্বিতীয় একটি চাকা বসানো থাকে। আর তারই কাছাকাছি আর একটি চাকা থাকে যার অক্ষ উপরের দিকে খাড়া। এই শেষের চাকাটি বলদের গলার দড়ির সংলগ্ন। বলদ দড়িতে টান দিলে শেষোক্ত চাকাটির দাঁতগুলো দ্বিতীয় চাকার সঙ্গে আটকে যায়।

বলদের টানে জলভরতি কলসীগুলি ওপরে ওঠার পর কুয়োর পাশে রাখা লম্বা সরু পাত্রে সেই জল গড়িয়ে পড়ে। এইখান থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে দেওয়া হয়।

আগ্রা, চন্দওয়ার, বিয়ানি এবং তার পাশাপাশি জায়গায় কৃষকরা বালতি করে ক্ষেতে জল দেয়। এটা একটা কষ্টসাধ্য জঘন্য ব্যবস্থা। কুয়োর ধারে সাঁড়াশির মত করে আড়াআড়ি ভাবে কাঠ পোঁতা হয়। মধ্যে থাকে একটা চরখি। একটা লম্বা দড়ির একপাশে একটা বড় বালতি বাঁধা হয় এবং দড়িটি চাকার মধ্যে বসানো হয়। দড়ির অন্য পাশ বলদের গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। একজন লোক বলদ চালায় ও আর একজন লোক জল ভরতি বালতি উঠলে জল ঢেলে নেয়। যতবারই বলদ দড়ির সাহায্যে কূপ থেকে বালতি তোলে সেই লম্বা দড়ি বলদের চলার পথে মাটিতে ছেঁচড়াতে থাকে এবং সেটা আবার কুয়োর মধ্যে প্রবেশ করার আগে মূত্র ও গোময়ে মাখামাখি হয়ে দূষিত হয়। কোনও কোনও শস্যক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষই বারংবার ঘড়া ঘড়া জল বয়ে নিয়ে ক্ষেতে জল দেয়।

—২—

হিন্দুস্থানের অন্যান্য বিবরণ

হিন্দুস্থানের নগর বা পল্লী—কোনওটাতেই মন আকর্ষণ করার মত কিছু নাই : সহর ও ফাঁকা জমি সব একরকমের—একঘেয়ে। উদ্যানের চারেপাশে কোনও বেড়া নাই। অধিকাংশই সজীবতাহীন সমতল ভূমি। বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারায় কোনোও কোনও নদী ও স্রোতস্বতীর তীর প্লাবিত হয়ে নানাস্থানে গভীর নালার সৃষ্টি করে। এমন হয় যে সেগুলি পার হয়ে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া কষ্টকর হয়। সমতলভূমির অনেকাংশ কাঁটা ও জঙ্গলে ভরা। এই সব সুন্দর সুরক্ষিত জায়গায় পরগণার যে সব লোক থাকে তারা বিদ্রোহী হয়ে রাজকর দেয় না।

এখানে ওখানে নদী ও বদ্ধ জলাশয় ছাড়া কোনও খাল নালা নাই। ব্যাপারটা এই যে সহর অথবা পল্লীর লোক কূপের জল—না হয় পুষ্করিণীতে বর্ষায় যে জল জমা হয় সেই জলের ওপর নির্ভর করে।

হিন্দুস্থানে ছোট বড় গ্রাম অথবা সহর একমুহূর্তে জনশূন্য—আবার এক মুহূর্তে

ভরতি হয়ে যেতে পারে। একটা বড় সহরের বাসিন্দারা যারা সেখানে অনেকদিন থেকে বাস করছে তারা যদি সহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা এমনভাবে সেটা করে যে তাদের কোনও চিহ্ন বা নিশানা সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে তাদের যদি এমন কোনও জায়গায় উপর দৃষ্টি পড়ে যে সেখানে তারা বাস করতে ইচ্ছুক, তাহলে তাদের জলের খাল খনন ও বাঁধ তৈরীর কোনও প্রয়োজন হয় না—কারণ তাদের খাদ্যশস্য বৃষ্টির জলেই জন্মায়।

হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা এমন বিপুল যে যেখানেই তারা বাসস্থান ঠিক করে সেখানেই পালে পালে লোক এসে হাজির হয়। তারা হয়তো একটা পুষ্করিণী খনন করে নেয়। তাদের বাড়ী তৈরীরও হাঙ্গামা নাই। ছাউনির ঘাস, বাঁশ ও কাঠ অনেক পাওয়া যায়। তাই দিয়ে অসংখ্য কুটির তৈরী হয়ে যায় এবং সোজাসুজি একটা গাঁ বা সহর গড়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের পশু

হিন্দুস্থানের যে জন্তুকে হাতী বলা হয় তার অনেক বিশেষত্ব। কাল্‌পি প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে এদের বাস। বুনোহাতীর সংখ্যাই উত্তরোত্তর বাড়তির দিকে দেখা যায়—যদি আরও পূর্ব্বদিকে কেউ যায়। এখান থেকে হাতী ধরা হয়। কারা এবং মানিকপুরের ত্রিশ চল্লিশটি গ্রামের লোক হাতী ধরার কাজ করে। তারা কত হাতী ধরলো তার হিসাব সরকারকে দিতে হয়। হাতি বিশালকায় জন্তু এবং খুবই বুদ্ধিমান। যদি কেউ তাকে কিছু বলে তাহলে সে সব বুঝতে পারে। যদি তাকে কিছু করবার জন্য হুকুম করা হয় তাহলে সে সেই হুকুম পালন করে। এর আকার অনুসারে মূল্য। হাতীকে মাপজোক করে মূল্য স্থির করার রেওয়াজ আছে। হাতী যত বড় তার মূল্যও তদনুপাতে বেশী। জনশ্রুতি এই যে কোনও কোনও দ্বীপে হাতীর উচ্চতা দশ 'কারি' (এক রকমের মাপ), কিন্তু এই দেশে চার পাঁচ 'কারির' বেশী উচু হাতী চোখে পড়ে না। হাতী শুঁড় দিয়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। যদি এর শুঁড় না থাকে তাহলে বাঁচতে পারে না। ওপরের চোয়াল থেকে বড় বড় দাঁত শুঁড়ের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়েছে। দেওয়াল কিংবা গাছের সঙ্গে সেই দাঁত লাগিয়ে হাতী ওগুলো উপড়ে ফেলতে পারে। এই দাঁত দিয়েই হাতী যুদ্ধ কিংবা যে সব কঠিন কাজ তাকে করতে হয় তা করে থাকে।

এর দাঁতকে গজদন্ত বলে। হিন্দুস্থানীরা হাতীর দাঁতকে খুব মূল্যবান মনে করে। হাতীর চুল নাই। যে সৈন্যদলের সঙ্গে হাতী থাকে তাদের খুবই ভরসা। হাতীর অনেক প্রয়োজনীয় গুণ আছে—যেমন, বিশাল নদী সাঁতার দিয়ে পার হওয়া, বড় ভারি মাল বহন করা। যে কামান বা ভারী অস্ত্রশস্ত্রবাহী শকটগুলি টানতে চার পাঁচশ লোকের দরকার সেগুলো তিন চারটে হাতী টানতে পারে। একটা হাতি এমন পরিমাণ শস্য খায় যা পনেরোটা উট খেতে পারে।

হিন্দুস্থানের আর এক জন্তু—গণ্ডার, এরও শরীর প্রকাণ্ড। আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে একটা গণ্ডার তার শিং দিয়ে একটা হাতীকে উপরে তুলতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণার সম্ভবত কোনও মূল্য নাই। গণ্ডারের নাকের উপর একটা শিং উচু দিকে এক বিঘত খাড়া—দুই বিঘত উচু গণ্ডারের শিং আমার চোখে পড়েনি। যাই হোক, একটা বড় শিং দিয়ে আমি একটা পানপাত্র, একটা পাশা খেলার ঘুঁটি ফেলার বাক্স তৈরী করেও তিন চার আঙ্গুল পরিমাণ শিং-এর অংশ অবশিষ্ট ছিল। গণ্ডারের চামড়া খুব পুরু। কোনও জোরালো ধনুকের জ্যা বগল পর্য্যন্ত সজোরে টেনে যদি তীর নিক্ষেপ করা যায় এবং যদি এই তীর চামড়ায় বিদ্ধও হয় তাহলে তিনি চার আঙ্গুলের মত একটা ক্ষত হতে পারে। এখানকার অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে, গণ্ডারের দেহের কোনও স্থানে এমন চামড়া আছে যথানে তীর বিদ্ধ হলে আরও গভীরে যেতে পারে। গণ্ডারের কাঁধের হাড়ের দুই পাশে এবং দুই উরুতে এমন চামড়ার ভাঁজ আছে যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কাপড়ের টুকরো ঝলঝল করে নড়ছে। গণ্ডারের সাদৃশ্য অন্য সব পশুর চেয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বেশী। ঘোড়ার যেমন পেট বড় গণ্ডারেরও তাই। ঘোড়ার সামনের পা যেমন অস্থিময় গণ্ডারেরও সেইরকম। হাতীর চেয়ে গণ্ডার বেশী হিংস্র। হাতীকে পোষ মানিয়ে বাধ্য করা যায়, গণ্ডারকে সে রকম করা কঠিন। পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে এবং সিন্ধু নদ ও মেহেরার মধ্যের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে সারু নদীর আশে পাশে অনেক গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে অভিযানের সময় পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে আমি প্রায়ই গণ্ডার শিকার করেছি। এরা শিং দিয়ে খুব জোরে গুতোতে পারে, যার ফলে আমার শিকারের সময় অনেক লোক এবং ঘোড়া আহত হয়েছে। একবার শিকারের সময় মকসুদ নামে একজন যুবকের ঘোড়াকে শিং

দিয়ে এমন গুতোয় যে একটা বর্শার ফলার সমান ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনার পর থেকে যুবকের নাম হয়ে যায় গণ্ডার মকসুদ।

আর একটি জন্তু হচ্ছে বুনো মোষ। সাধারণ গৃহপালিত মোষের চেয়ে এর দেহ বড়। এর শিং সাধারণ মোষের মতই। এরা অত্যন্ত সাংঘাতিক ও হিংস্র।

আর এক রকমের জন্তু নীল-গৌ (গাই)। উচ্চতায় এরা প্রায় ঘোড়ার সমান। ঘোড়ার চেয়ে এরা কিছু শীর্ণ; পুরুষ-গৌ নীলাভ, সেই জন্যই এদের নীল গৌ বলা হয়। এর দুটো ছোট ছোট শিং এবং ঘাড়ের ওপর চুল আছে। ঘাড়ের নীচের দিকে খুব ঘন চুলের গোছা, যা দেখতে অনেকটা পাহাড়ি গাইয়ের চুলের গোছার মত। এর লেজ ষাঁড়ের মত। স্ত্রী-গৌদের গায়ের রং গওয়া-জেন্ হরিণের মত। স্ত্রী-গৌদের শিং নাই, ঘাড়ের নীচে চুলও নাই। পুরুষ-গৌয়ের চেয়ে স্ত্রী-গৌয়ের শরীর কিছু মোটা সোটা।

আর এক জন্তুর নাম—কোটা-পইচে অর্থাৎ খাটোপা শূকর হরিণ। এরা আয়তনে অনেকটা শ্বেত হরিণের সমান। এদের সামনের পা দুটো ও উরু ছোট এবং সেইজন্যই এর নাম হয়েছে খাটো পা শূকর হরিণ। শৃঙ্গি হরিণের মত অতটা না হলেও এদেরও শিং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পুরুষ হরিণের মত এরাও শিং এর খোলস ছাড়ে। এই জাতীয় হরিণ ভাল দৌড়াতে পারে না। সেই জন্য জঙ্গল ছেড়ে আসতে চায় না।

আর এক জাতের হরিণ আছে যার পিঠ কালো। পেটের রং সাদা, শিং খুব লম্বা ও বাঁকা। হিন্দুস্থানীরা এই জাতের হরিণকে বলে—'কাল হরে।' কাল হরে কথাটার অর্থ সম্ভবতঃ কালা হরিণ অর্থাৎ কাল রঙের হরিণ। কালা হরিণ থেকেই কালহরে হওয়া সম্ভব। পোষা কালহরে হরিণের সাহায্যে এখানকার লোক বুনো হরিণ ধরে। কালহরের শিং এ তারা গোলাকার জাল বেঁধে দেয় এবং একটা ফুটবলের চেয়েও বড় পাথর পেছনের একটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তার অর্থ এই যে তার সাহায্যে অন্য হরিণ ধরা পড়লে সে যেন দূরে চলে না যেতে পারে। কোনও বুনো হরিণ দেখা গেলে পোষা হরিণটাকে তার সম্মুখে আনা হয়। সে শিং উঁচিয়ে ঢুঁ মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুনোটার দিকে এগিয়ে যায়। এই জাতের হরিণ লড়াই করতে ভাল বাসে এবং শিং দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ধাওয়া করে। দুই পক্ষ যখন পরস্পরকে শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে তখন একবার পিছিয়ে একবার এগিয়ে

যাওয়ার সময় যে জালটা পোষা হরিণের শিং এ বাঁধা থাকে সেই জালে বুনো হরিণের শিং জড়িয়ে যায়। যদিও বুনো হরিণটা পালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে থাকে—কিন্তু পোষা হরিণটা মোটেই পালানোর কোনও উদ্যম দেখায় না। তা ছাড়া, পায়ে পাথর বাঁধা থাকার জন্য তার গতিও বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণে বুনোটার পালান কঠিন হয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক বুনো হরিণ ধরা পড়ে এবং পরে তাদের পোষ মানানো হয়। এই পদ্ধতি ছাড়াও জাল দিয়ে ঘিরেও অনেক হরিণ ধরা হয়ে থাকে। এখানকার লোকেরা হরিণ ধরে পোষ মানিয়ে নিজেদের ঘরে বসে হরিণের লড়াই দেখে। হরিণের লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের ধারে ধারে আর এক রকমের ছোট জাতের হরিণ দেখা যায়। এদের শরীরের আয়তন এক বছর বয়সের ভেড়ার সমান।

আর এক জাতের হরিণের নাম গৌ-গিনি। এরা এদেশের ছোট জাতের গরুর মত, আর আমাদের দেশের বড় জাতের ভেড়ার মত। এর মাংস খুব নরম ও সুস্বাদু।

আর একজাতের জন্তু আছে যাদের হিন্দুস্থানীরা বাঁদর বলে। বাঁদরের অনেক রকম—জাত। এক রকমের বাঁদর আমাদের দেশে নিয়ে যেতে দেখা যায়। বাজিকররা এদের দিয়ে নানা রকমের খেলা দেখায়। নূরদরার পার্ব্বত্য প্রদেশে, খাইবারের নিকটবর্ত্তী সফিদ কো'য় পাহাড়ের প্রান্তদেশে, এবং সেখান থেকে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের খুব ওপরে এরা থাকে না। এর গায়ের চুল পীতাভ, মুখ সাদা এবং লেজ খুব লম্বা হয়। আর এক রকমের জাত হিন্দুস্থানে দেখা যায়, যেগুলো বাজুর, সাওয়াদ বা তার কাছাকাছি জায়গায় চোখে পড়ে না। আমাদের দেশে যে বাঁদর নিয়ে যাওয়া হয় তার চেয়ে এগুলো অনেক বড়। এর লেজ খুব লম্বা চুল সাদাটে এবং মুখ গভীর কালো। হিন্দুস্থানের পাহাড়ে জঙ্গলে এদের দেখা যায়। আর এক জাত আছে যাদের চুল, মুখ ও শরীর সবই কালো।

নেউল আর একরকমের জন্তু। 'কিশ'-এর চেয়ে এগুলো আকারে ছোট। এরা গাছে চড়ে। অনেকে এর নাম বলে মুস-ই-খুরমা (তালগাছের ইঁদুর)। এগুলো দেখানাকি সৌভাগ্যরচিহ্ন।

ইঁদুর জাতের আর এক রকম প্রাণী আছে যাদের গাচ্‌রি (কাঠ বেড়াল)

বলা হয়। এরা প্রায় সব সময়েই গাছে থাকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা গাছ থেকে ওঠা-নামা করে।

হিন্দুস্থানের পাখী

ময়ূর—এর রং অতি চমৎকার। এর গঠন-সৌন্দর্য্য এর রংয়ের মত নয়। ময়ূর আকারে হয়তো সারস পাখীর মত হতে পারে, কিন্তু অতটা লম্বা নয়। ময়ূরীদের রংয়ের বাহার নাই। ময়ূরের মাথায় রামধনুর রং। গ্রীবায় সুন্দর নীল ও বেগুনি রংয়ের সমাবেশ। পিঠের ওপরের চক্রগুলি ছোট ছোট, কিন্তু যত নীচে নেমে এসেছে সেগুলো ক্রমশঃ তত বড় হয়ে উঠেছে। তবে রংয়ের বাহার পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত একই রকমের। কোনও কোনও ময়ূর পুচ্ছ মেললে তার মাপ মানুষ দুই হাত বিস্তার করলে যতটা হয় ততটা। এর চিত্রিত পুচ্ছের নীচে অন্য পাখীর মত একটা সাধারণ ছোট লেজ আছে। এই ছোট লেজের পালকের প্রান্তগুলি লাল রংয়ের। বাজুর, সাওয়াদ এবং তারও নীচের দেশ-গুলিতে ময়ূর দেখা যায়, কিন্তু কুনার কিংবা লামঘানাতে অথবা তার উপরের দেশগুলিতে ময়ূর দেখা যায় না। ফেজেণ্ট পাখীর চেয়েও ময়ূরের ওড়ার শক্তি কম। দুই একবারের বেশী ছোট রকমের ওড়াও এদের সাধ্যে কুলায় না। ওড়বার ক্ষমতা সীমিত থাকায় এরা পাহাড়ে ও জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—যে জঙ্গলে শেয়াল বেশী সেখানে ময়ূরও ঘুরে বেড়ায় বেশী। শেয়ালরা এই সব ময়ূরের কতই না ক্ষতি করতে পারে যেখানে তাদের লেজ মানুষের দুই হাতের মত লম্বা। ইমাম আবু হানিফার মতে ময়ূরের মাংস অনুমোদিত খাদ্য। এর মাংস অনেকটা তিতিরের মাংসের মত এবং খেতেও বিস্বাদ নয়। তবে উটের মাংস খেতে যেমন রুচি হয় না, এর মাংসও অনেকটা সেইরকম অরুচিকর।

তোতা—এই পাখী বাজুর এবং তার নীচের দেশগুলিতেও চোখে পড়ে। গ্রীষ্মকালে যখন তুঁত ফল পাকে, তখন এদের সিংনাহার এবং লামঘানাতেও দেখা যায়। অন্য সময় এরা এখানে থাকে না। এই পাখী নানারকমের জাতের আছে—আর এক জাতের আছে যেগুলো এই দেশ থেকে আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পাখীকে কথা বলতে শেখানো হয়। এদের বলে জঙ্গলি তোতা। বাজুর, সাওয়াদ এবং এর নিকটবর্ত্তী দেশে প্রচুর তোতা পাখী দেখা

যায়—এমন কি এদের পাঁচ ছয় হাজারের উড়ন্ত ঝাঁকও চোখে পড়ে। জঙ্গলি তোতা এবং আর একরকমের তোতার কথা যা সর্ব্ব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু দেহের আয়তনের দিক দিয়ে। পালকের রং কিন্তু হুবহু এক। আর এক রকমের জাত আছে যেগুলো জঙ্গলি তোতার চেয়েও ছোট। এদের মাথা লাল রংয়ের এবং ডানার ওপরের অংশও লাল। এর পুচ্ছের প্রান্তভাগ দশ আঙ্গুল চওড়া এবং উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট। এই জাতের কোনও কোনও পাখীর মাথা রামধনু রংয়ের। এগুলো কথা বলতে শেখে না। এ দেশের লোকেরা এদের বলে—কাশ্মীরী তোতা।

আর এক জাতের তোতা আছে তারাও জঙ্গলি তোতার চেয়ে আকৃতিতে ছোট। এর চক্ষু কালো এবং গ্রীবায় কালো রংয়ের বন্ধনী। এর ডানা লাল রংয়ের। এরা খুব সুন্দর কথা বলতে শেখে। আমাদের ধারণা ছিল যে তোতা কিংবা সারককে (ময়না) যে কথা বলতে শেখানো হয় শুধু সেইগুলিই বলতে পারে অন্য কোনও বুলি তাদের মগজে আসে না। একবার আমার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য—তার নাম আবুল কাশেম জানোয়ার—আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনায়। কথা বলতে পারে এমন একটা তোতার খাঁচা নিশ্চয়ই কাপড়ে ঘেরা ছিল। সে হঠাৎ বলে ওঠে—কাপড়ের ঢাকনি খুলে দাও, আমার দম আটকে আসছে। যে এই কথা আমাকে জানায় তাকে বিশ্বাস করা না করা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে নিজের কানে না শুনলে একথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন।

আর এক জাতের তোতা আছে যাদের রং গাঢ় লাল। অন্য রংয়েরও এ জাতের পাখী আছে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না—সেই জন্য তাদের বর্ণনা দিতে পারলাম না। যাহোক, এ জাতের পাখী রংয়ে ও আকৃতিতে খুবই সুন্দর। এদের কথা বলতে শেখানো হয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে যে এদের গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—ঠিক তামার থালায় ভাঙ্গা চিনা মাটির বাসন টেনে নিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম।

সারক (ময়না)—এই পাখী লামঘানাত ও তার নীচের দেশ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র প্রচুর দেখা যায়। এ পাখীও নানা ধরণের হয়। লামঘানাতে এই জাতের যে পাখী অসংখ্য দেখা যায় তার মাথা কালো এবং ডানাগুলো দাগ-বিশিষ্ট। তুর্কির 'চুখুর চিক্' পাখীর চেয়ে এরা আকৃতিতে বড় এবং মোট। এদের কথা বলতে শেখানো হয়।

গিণ্ডাওয়ালি নামে আর এক জাতের ময়না বঙ্গদেশ থেকে আনা হয়। এরা আকারে সারকদের চেয়ে বড়। এর চঞ্চু ও পা পীতবর্ণের এবং প্রত্যেক কানে পীতবর্ণের চামড়ার ঝুলি আছে যা দেখতে কুশ্রী। এ পাখী খুব পরিষ্কার কথা বলতে পারে।

আর এক রকমের সারক আছে যার শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং তার চোখের চার ধারে লালরংয়ের রেখা আছে। এ গুলো কথা বলতে পারে না। লোকে এগুলোকে বলে-বুনো সারক।

যখন আমি ৯৩৪ হিজরি সনে গঙ্গার ওপর সেতু তৈরী করে গঙ্গা পার হয়ে শত্রুদের বিতাড়িত করি সেই সময় লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার কাছাকাছি জায়গায় একরকম সারক প্রথম দেখি—যার বুক সাদা, মাথা নানা রংয়ের এবং পিঠ কালো। এই জাতের পাখী কথা বলতে পারে না।

লুজ্ আর এক রকমের পাখী। আরবিতে এই পাখীকে 'বু-কালামুন' (গিরগিটি জাতীয়) বলে। কারণ-এর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত, পায়রার মাথার মত পাঁচ ছয় রকমের রং আছে যা অনবরত বদলায়। কাবুল দেশের নিগার-অ' পর্ব্বতে এবং তার নীচু দিকের পাহাড়ে এই পাখী দেখা যায়, ওপরের দিকে দেখা যায় না। এই পাখী সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শোনা যায়। যখন এই পাখী শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের প্রান্তে এসে নামতে থাকে এবং তখন যদি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ওপর এসে পড়ে তাহলে আর উড়ে যেতে পারেনা এবং এই সময় তারা ধরা পড়ে। আল্লা জানেন-এই কথার মধ্যে সত্য কতখানি। এই পাখীর মাংস খুবই সুস্বাদু।

তুররাজ (তিতির)—এ পাখী শুধু হিন্দুস্থানেরই বিশেষত্ব নয়। দক্ষিণ আফগানিস্থানেও এ পাখী দেখা যায়। তবে এর কয়েকটি জাত হিন্দুস্থানেই দেখা যায়। তার সম্বন্ধেই বলা হবে। তুররাজের আকার কিক্লিকের মত। পুং তিতিরের পিঠের রং স্ত্রী-ফেজেণ্টের পিঠের রং এর মত। এর গ্রীবা ও বুক কালো—তাতে সাদা রংয়ের ফুটকি। লাল রংয়ের রেখা দুই চোখের দুই পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। এর বুলি হচ্ছে শির দিরাম-সাকরাক। (অর্থ—আমার দুধও আছে চিনিও আছে)। শির কথাটা এরা আস্তে এবং দিরাম্ সাকরাক শব্দ জোরে পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে। আস্তারাবাদের তিতির 'বাল-মিমি তুতিলার (অর্থ আমাকে ধরে ফেলেছে শীগ্‌গির এস) বলে চেঁচায়। আরব

দেশের তিতিরের বুলি নাকি—'বিল শকর তদম অল মিয়াম' (অর্থ, চিনি থাকলেই স্ফূর্ত্তির অভাব হয় না)।

স্ত্রী-তিতিরের গায়ের রং ফেজেণ্ট শাবকের মত। এই পাখী নিগরঅ'র নীচের দেশেও দেখা যায়।

আর এক রকমের জাত আছে যাকে 'কানিয়াল' বলা হয়। আকৃতিতে এরা উপরি উল্লিখিত জাতেরই মত। এর কণ্ঠস্বর কিকলিক পাখীর মত কিন্তু স্বর তার চেয়ে তীক্ষ্ণ। এ জাতের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রংয়ের কোনও তফাৎ নাই। এই পাখী পরা-শাওয়ার, হাস্‌নাঘর এবং তার নীচের দেশগুলোতে দেখা যায়, কিন্তু ওপরের দিকে নয়।

ফুল পাইকার (সম্ভবতঃ এ পাখী ধুসর রংয়ের তিতির)—এর আকৃতি কবজ্‌ই-চুরি পাখীর মত। এর চেহারার সঙ্গে গোবর-গাদার মোরগের সাদৃশ্য আছে। এর রং মুরগীর মত কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত এর রং উজ্জ্বল লাল। এ পাখী হিন্দুস্থানের পার্ব্বত্য দেশেই দেখা যায়।

মুরগে-এ-সারা (বনমুরগী)—এই পাখীর সঙ্গে গৃহপালিত মুরগীর তফাৎ এই যে এরা ফেজেণ্ট পাখীর মত উড়তে পারে। গৃহপালিত মোরগের মত এরা নানা বর্ণের নয়। বাজুরের পার্ব্বত্য দেশে এবং তার নীচের দিকের দেশে এ পাখী দেখা যায় কিন্তু উপরের দিকে দেখা যায় না।

চেল্‌সি—এই পাখীও ফুল পাইকারের মত। কিন্তু ফুল পাইকারের রং বেশী সুন্দর। বাজুরের পা৲ত্য দেশে এ পাখী দেখা যায়।

শ্যাম—এরা আকারে সাধারণ মোরগের মত। গায়ের রং নানা রকমের। এ পাখীও বাজুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যায়।

বুদিনে —(তিতির জাতীয় পাখী)—এই পাখী হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য নয় তবে চারপাঁচ রকমের এই জাতীয় পাখী হিন্দুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখীর এক রকমের জাত আমাদের দেশেও যেতে দেখা যায়। তবে সেগুলো সাধারণ বুদিনের চেয়ে দেখতে বড়। আর এক রকমের জাত আছে সেগুলো আমাদের দেশে যে ধরণের পাখী দেখা যায় তার চেয়ে ছোট। এর ডানা ও লেজের রং রক্তাভ। চির পাখীর মত বুদিনের উড়ন ভঙ্গী।

এছাড়া এই জাতীর আর এক রকমের পাখী আছে। সেগুলোও আমাদের দেশে যে পাখী যায় তার চেয়ে আকারে ছোট। এর বুকের এবং গলার রং

সাধারণত কালো। আর এক জাত আছে যে গুলো কদাচিৎ কাবুলে যায়। এগুলো আকারে 'কারচে' পাখীর চেয়ে বড়। কাবুলিরা এ পাখীকে কুরাতু বলে।

খরচাৎ (পারসা)—এ পাখীর আকার তুাক দেশের তুখ্‌তাক পাখীর মত একে হিন্দুস্থানের তুখ্‌তাক পাখীও বলা যায়। এর মাংস সুস্বাদু। কোনও কোনও পাখীর পা এবং কোনও কোনও পাখীর ডানা খেতে ভাল। মোটের উপর এই পাখীর দেহের সমস্ত অংশের মাংসই উপাদেয়।

চারজ্ (পারসী)—তুঘদিরি পাখীর চেয়ে এ পাখী আকারে ছোট। পুং-জাতীয় পাখী তুঘদিরি পাখীর মত, তবে এর বুক কালো। স্ত্রী-জাতীয় পাখীর রং একই রকমের।

বাঘ্‌রি-কারা (পাহাড়ি পায়রা)—পশ্চিমের বাঘ্‌রিকারা পাখীর চেয়ে হিন্দুস্থানের এই পাখী আকারে ছোট ও রোগা এবং স্বরও তীক্ষ্ণ।

দিং—জলে এবং নদীর তীরে যে সব পাখী দেখা যায় তার মধ্যে দিং একটি। এরা ওজনে খুব ভারী, এর প্রতিটি ডানা মানুষের মত লম্বা। এর মাথায় কিংবা গলার কোনও লোম নাই। একটা থলের মত জিনিষ এর গলা থেকে ঝোলে। এর পিঠ কালো, বুক সাদা। এই জাতের পাখী মাঝে মাঝে কাবুলেও যায়। এক বছর এই পাখী একটা ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। পাখীটা খুব পোষ মেনেছিল। এর দিকে খাদ্য ছুঁড়ে দিলে ঠোঁটের ফাঁকে সেটা লুফে নেয়, কোনও সময়েই বিফল হতো না। একবার ছয়টা নাল লাগানো জুতা এবং আর একবার সাদা মোরগ পাখা ও লোম সহ আস্ত গিলে ফেলে।

সারস—হিন্দুস্থানবাসী তুর্কিরা একে বলে তিওয়া তার্ণা (উট সারস)। দিং এর চেয়ে এ পাখী আকৃতিতে ছোট হতে পারে কিন্তু গলা লম্বা। এর মাথা লাল। লোকে এই পাখী বাড়ীতে রাখে। এরা খুব পোষ মানে।

মানেক (মাণিক জোড়)—এ পাখীর উচ্চতা সারস পাখীর মত কিন্তু আকারে ক্ষীণ। মাণিক জোড় এক রকমের সারস পাখী বলেই বোধ হয়। সারস পাখীর চেয়ে এর ঠোঁট বড় এবং রং কালো। এর মাথা মসৃণ ও চকচকে, গলা সাদা এবং ডানা নানা রংয়ের। এর পালকের প্রান্ত ও গোড়ার অংশ সাদা এবং মধ্য ভাগ কালো।

ল্যাগ্‌ল্যাগ্—এ পাখীও একজাতীয় সারস। এর গলা সাদা, দেহের অন্যান্য অংশ কালো। এ পাখী আমাদের দেশেও দেখা যায় কিন্তু তারা

আকারে ছোট। কোনও কোনও হিন্দুস্থানী এ পাখীকে ইয়েক রং (এক রং ? বলে।

আর এক জাতের সারস আছে যার গায়ের রং ও আকার ঠিক আমাদের দেশের এই জাতীয় পাখীর মত। তবে এর ঠোঁট একটু বেশী কালো এবং ওজনেও ল্যাগল্যাগের চেয়ে কম ভারি।

আর এক রকমের পাখী আছে যা দেখতে ধূসর রংয়ের বক ও ল্যাগল্যাগের মত। কিন্তু এর চঞ্চু বকের চেয়ে লম্বা এবং শরীর ল্যাগল্যাগের চেয়ে ছোট।

বড়বুজাক—এই পাখীর দেহের ওজন তুর্কির 'কার' পাখীর মত। এর ডানার নীচের দিকে সাদা। এর গলার স্বর খুব জোরালো।

সাদা বুজার—এর মাথা আর ঠোঁট কালো। আমাদের দেশে এই রকমের যে পাখী দেখা যায় তারা অনেক বড়, কিন্তু হিন্দুস্থানের বুজাকের চেয়ে দেখতে ছোট।

ঘরম্ পাই—(হাঁস জাতীয় যার চক্ষুতে ফুটকি দাগ আছে)—এগুলো বুনো হাঁসের চেয়ে বড়। এই জাতের স্ত্রী ও পুরুষ একই রংয়ের। এই পাখী হাসনাঘরে ওরা লামঘানাতে যায়। এর মাংস খুব সুস্বাদু।

সা-মুরগ্—এই পাখী রাজহাঁসের চেয়ে ছোট। চঞ্চুর ওপরটা স্ফীত ও পিঠের রং কালো। এর মাংস খেতে খুবই উপাদেয়।

আলা কুর-ঘে (ম্যাগ্ পাই)-আমাদের দেশের এই জাতের পাখীর চেয়ে এরা আকারে ছোট। এর গলায় সাদা রংয়ের দাগ আছে।

আর এক জাতের পাখী আছে যাদের সাথে দাঁড়কাকের কিছু সাদৃস্য লক্ষ্য করা যায়। লামঘানাতে এই পাখীকেও বুনো মুরগী বলা হয়। এর মাথা আর বুক কালো, ডানা ও লেজ লাল ও চোখের রং গভীর রক্তবর্ণ। দুর্ব্বল বলে এই পাখী ভাল উড়তে পারে না। সেইজন্য এরা বন জঙ্গল ছেড়ে বাইরে আসেনা। এই জন্যই এদের বুনো মুরগী বলা হয়।

বাদুড়—অনেকে এদের চাম-গিধর অর্থাৎ উড়ন্ত শেয়াল বলে। এরা আকারে প্যাঁচার সমান এবং মাথাটা পশু শাবকের মত। গাছের শাখা ধরে মাথা নীচু করে এরা ঝুলতে ঝুলতে বিশ্রাম করে। এ দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত।

আ—আকে (আরবী)—হিন্দুস্থানে এই জাতীয় পাখীকে মিতা বলে। দেশে সাধারণ আ-আকে পাখীর চেয়ে এগুলো ছোট। আরব দেশের আ-আকে

পাখীর রং সাদা ও কালোয় মেশানো, আর হিন্দুস্থানের এই জাতের পাখীর রং ধূসর ও কালো।

কারচে—এ পাখী দোয়েলের মত দেখতে কিন্তু আকারে এর চেয়ে বড়। এর রং আগাগোড়া কালো।

আর এক রকমের ছোট পাখী আছে যা আকারে তুর্কিদেশের সাগুলাক পাখীর মত। এর রং সুন্দর লাল, তবে ডানায় কালো দাগ আছে।

কুইল (কোয়েল-কোকিল)—এ পাখী আকারে প্রায় কাকের মত কিন্তু অনেক রোগা। এর কণ্ঠে গান আছে যেজন্য এই পাখীকে হিন্দুস্থানের বুলবুল বলা হয়। হিন্দুস্থানের এই পাখীর সম্মান আমাদের দেশের বুলবুলের মত। এরা ঘন বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে থাকে।

আরব দেশের শিকার-রাক পাখীর মত এ দেশেও এক রকমের পাখী আছে। এই পাখী গাছ আঁকড়িয়ে থাকে। এদের বলা হয় কাঠ-ঠোকরা।

হিন্দুস্থানের জলজন্তু

জলজন্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে কুমির। স্থির জলে এদের বাস। এরা মানুষ —এমন কি মোষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কুমিরের এক রকমের জাত আছে যাকে বলে সিপ্‌সার। হিন্দুস্থানের সব নদীতেই এরা ঘুরে বেড়ায়। একটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেটা লম্বায় ছিল চার পাঁচ গজ। কোনও কোনটা এর চেয়ে বড় হয়। এর মুখ ও নাক ওপরের দিকে আধ গজ লম্বা। কুমিরের নীচ ও ওপরের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট দাঁতের সারি। এরা জল থেকে উঠে এসে জলের ধারে ঘুমায়।

আর একরকমের জলজন্তু—শুশুক। হিন্দুস্থানের সমস্ত নদীতেই এদের দেখা যায়। এরা ঝাঁকি মেরে জল থেকে মাথা তুলে আবার জলে ডুব দেয়—তখন আর এক লেজ ছাড়া দেহের কোনও অংশই দেখা যায় না। এর চোয়ালও অনেকটা কুমিরের চোয়ালের মত। এর চোয়াল লম্বা এবং দাঁতের সারিও ঐ একই রকম। কিন্তু অন্য বিষয়ে এর শরীর ও মাথা মাছেরই মত। যখন এরা খেলা করে তখন এদের ভিস্তির মশকের মত দেখায়। সারু নদীতে যে সব শুশুক আছে তারা জলে খেলার সময় লাফিয়ে সমস্ত শরীরটাই জলের ওপরে তুলতে পারে। এরা মাছের মতই জল ছেড়ে থাকতে পারে না।

ঘড়িয়াল আর এক রকমের জলজন্তু। আমার অনেক সৈন্যই সারু নদীতে

এই জলজন্তু দেখেছিল। এরাও মানুষ ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যে সময় আমরা সারুনদীর ওপরে ছিলাম সেই সময় দুই একজন ক্রীতদাস বালককে ঘড়িয়াল জলের তলে টেনে নিয়ে যায়। এই জায়গায় দূর থেকে ঘড়িয়াল দেখেছিলাম, কিন্তু এর সম্পূর্ণ চেহারা আমার নজরে পড়েনি।

এক রকমের মাছ হচ্ছে—ক'কে। এর দুই কানের সমান্তরালে দুটো হাড় —যা লম্বায় তিন আঙ্গুল পরিমাণ। এই মাছ ধরা পড়লে যখন হাড় দুটো নাড়ে তখন এক রকম শব্দ বের হতে থাকে। এর জন্যই নাকি এর নাম হয়েছে ক'কে।

হিন্দুস্থানের মাছ খেতে সুস্বাদু। এদের খুব অল্পই ছোট ছোট কাঁটা আছে। এরা অদ্ভুত চটপটে। একবার জাল ফেলে নদীর এ পাশ ও পাশ ছেঁকে ফেলা হয়। অনেক মাছ জালে ধরা পড়ে। জালের দুই পাশ আধগজ পরিমাণ উঁচু করে তোলা হলো। তখন অনেক মাছ একের পর এক গজখানেক জালের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ ছাড়া হিন্দুস্থানে এমন অনেক ছোট ছোট মাছ আছে যারা কোনও জোর শব্দ—এমন কি পদধ্বনি শুনলেও জলের ওপর এক দেড় গজ লাফিয়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের ব্যাং দেখবার মত। যদিও এগুলো আমাদের দেশের ব্যাং এর জাতেরই মত, কিন্তু জলের ওপর ছয় সাত গজ দৌড়িয়ে যেতে পারে।

হিন্দুস্থানের ফল

আম্‌বে (আম) হিন্দুস্থানের বিশেষ ফলের মধ্যে প্রধান। প্রসিদ্ধ কবি খাজা খসরু বলেছেন—

'হে আম্রসুন্দরী, তুমি উদ্যানের শোভা
হিন্দুস্থানের ফলের মধ্যে তুমিই মনোলোভা।

যে আম ভাল জাতের সেগুলো খুব সুস্বাদু। হরেক রকমের আমই লোকে খায়, তবে সবই ভাল নয়। এদেশের লোক কাঁচা আম পেড়ে বাড়ীতে রেখে পাকায়। কাঁচা আমের টক খেতে ভাল এবং এ দিয়ে সুন্দর আচার তৈরী হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দুস্থানে এইটিই সব চেয়ে ভাল ফল। এর গাছ খুব বড় হয় এবং একটা গাছে অনেক ফল ধরে। অনেকে আমের এমন প্রশংসা করে যে একমাত্র খরমুজা ছাড়া আর কোনও ফলেরই আমের সঙ্গে তুলনা হয় না। আম এতটা প্রশংসার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আম দুই রকম ভাবে খাওয়া হয়। একরকম আম এখানকার লোকেরা হাত দিয়ে টিপে টিপে নরম করে নিয়ে এর একপাশে ছেঁদা করে সেইখানে মুখ লাগিয়ে রস চুষে নেয়। আর একরকমের আম কার্দি পিচের মত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তবে খায়। এর ছাল দেখতে অনেকটা পিচের মত। বাংলা ও গুজরাটের আম খেতে খুব সুন্দর।

কলা—এখানকার আর একটা ফল—কলা। আরবদেশের লোকেরা একে বলে মেজি। এর গাছ খুব বড় হয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে কলা গাছ বৃক্ষ পর্যায়েরও নয়। এক রকম সবজি জাতীয় উদ্ভিদ। কলার পাতা লম্বায় প্রায় দুই গজ। চওড়ায় গজ খানেক। কলা গাছের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের মত একটা নব পল্লব বেরিয়ে আসে। কলার মুকুল (মোচা) এই পল্লব থেকে ঝুলে পড়ে। কলার মোচা যেন একটা ভেড়ার হৃৎপিণ্ড। যখন এই মোচা এক একটা খোলস ছাড়ে তখন ছয় সাতটা ফুলের সারি বের হয়। এই ভাবে খোলস ছাড়তে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ কলার সারি দেখা দেয়। প্রথমে যা থাকে ফুল, ক্রমে পুষ্ট হয়ে কলার আকার ধারণ করে নয়ন গোচর হয়। কলার দুইটি গুণ—প্রথমতঃ এই ফল অনায়সেই ছাড়ানো যায়, দ্বিতীয়তঃ এর কোনও বীচি নাই এবং খেতে মোলায়েম। বেগুনের চেয়ে কলা লম্বা ও সরু। কলা খেতে খুব মিষ্টি নয়, কিন্তু বাংলা দেশের কলা খুব মিষ্টি। কলা গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এর পাতা বেশ চওড়া এবং রং উজ্জ্বল সবুজ।

মহুয়া—একে গুলচিকান বলা হয়। এ গাছ খুব ঝাঁকড়া হয়। হিন্দুস্থানীরা তাদের ঘর সাধারণতঃ এই গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী করে। মহুয়ার ফল থেকে এক রকমের মদ হয়। হিন্দুস্থানীরা এই ফুল শুকনো করে কিস্‌মিসের মত খায়। এই থেকেই মদ তৈরী হয়। কিসমিসের সাথে এর খুব সাদৃশ্য আছে। এর গন্ধ ভাল নয়, খেতে খুব সুস্বাদু নয়। মহুয়ার গাছ বুনো ধরণের। মহুয়া ফল খেতেও সুবিধার নয়। এর বীচি আকারে বড়। খোসা পাতলা। বীচির শাঁস থেকে এক রকমের তেল তৈরী হয়।

আম্বলি—এই ফল এক জাতের হিন্দুস্থানী খেজুর। এর ছোট ছোট পাতা খাঁজকাটা ঠিক জায়ফল গাছের পাতার মত। তবে এই গাছের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট। এই গাছ খুব সুন্দর এবং বহুল-পরিমাণে ছায়া দান করে। গাছও খুব বড় হয় এবং বন জঙ্গলে অসংখ্য জন্মে।

কিরণি—এই ফলের গাছ সাধারণতঃ গুজরাটে দেখা যায়। এই গাছ ঝাকড়া না হলেও ছোট আকারের নয়। এর ফল পীত বর্ণের, কুলের চেয়ে আকারে ছোট ও স্বাদে আঙ্গুরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে খাওয়ার পর শেষে একটা খারাপ স্বাদ রেখে যায়। তাহলেও এ ফল ভাল এবং খাওয়াও চলে। এর বীচির খোসা পাতলা।

জামান (জাম)—এর গাছের পাতা উইলো গাছের পাতার মত, তবে একটু বেশী সরু এবং সবুজ। মোটের ওপর এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এই গাছের ফল কালো আঙ্গুলের মত দেখায়। কিন্তু এতে অম্লস্বাদ বেশী, খেতেও অত সুস্বাদু নয়।

কারমেরিক (কামরাঙ্গা) এই ফলের পাঁচটি ধার। আকারে পিচের মত, লম্বায় চার পাঁচ আঙ্গুলের সমান। পাকলে এর রং পীত বর্ণের হয়। এই ফলের কোনও বীচি নাই। কাঁচা গাছ থেকে তুললে খেতে বেশ তেতো। কিন্তু ভাল ভাবে পাকলে এর বেশ মিষ্ট সুগন্ধি অম্ল স্বাদ।

কাঢাইল (কাঁঠাল)—এই ফল দেখতে খারাপ, গন্ধও ভাল নয়। দেখায় যেন ভেড়ার ভরা পেটের মত। খেতে মিষ্টি, কিন্তু বিস্বাদ জনক। এর ভেতরের বীচি হেজেল গাছের বাদামের মত। এই বীচির সাথে খেজুর, বীচির সাদৃশ্য আছে, যদিও কাঁঠালের বীচি অনেকটা গোলাকার এবং খেজুরের বীচির মত শক্ত নয়। কাঁঠালের বীচিও লোকে খায়। কাঁঠালে খুব আঠা আছে। এই আঠার জন্য কাঁঠাল খাওয়ার আগে অনেকে মুখে (হাতে ও) তেল মেখে নেয়। কাঁঠাল কেবল গাছের শাখা ও কাণ্ডতেই ফলে না, গাছের মূলের কাছেও ফলে। কাঁঠাল গাছ দেখলে মনে হবে যেন চারদিকে ভেড়ার পেট ঝুলছে।

বাধিল্—এই ফল আকারে আপেলের মত। খুব খারাপ গন্ধ না হলেও এ ফল রসহীন ও বিস্বাদ।

বইর—পারস্য দেশে এর নাম বুনার। এ ফল নানা রকমের হয়। আলুচের (কুল) চেয়ে এ ফল কিছু লম্বা। একরমের জাত আছে যা আকারে এবং দেখতেও হুসেনি আঙ্গুরের মত। কিন্তু এ জাতের ফল কদাচিৎ খেতে ভাল হয়। আমি এক রকম জাতের বইর দেখেছিলাম যা খেতে খুব ভাল। বৃষ ও মিথুন রাশির স্থিতি কালে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কর্কট সিংহ রাশির স্থিতি কালে অর্থাৎ বর্ষার ঋতুতে নতুন পাতা গজায়। তখন গাছ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়। কুম্ভ ও মীন রাশির অবস্থান কালে এর ফল পাকে।

করেন্দা—আমাদের দেশের 'জিকে' গাছের মত এ গাছ ঝুপসি হয়। জিকে পাহাড়ি দেশে জন্মে, কিন্তু করেন্দা জন্মে সমতল ভূমিতে। এই ফলের গন্ধ 'মারমেনজানের' মত, কিন্তু তার চেয়ে বেশী মিষ্ট তবে রস কম।

পানিয়ালা—এই ফল কুলের চেয়ে বড় এবং লাল আপেলের মত দেখায়। খেতে অম্লস্বাদ কিন্তু সুস্বাদু। ডালিমের গাছের চেয়ে এ গাছ বড় হয়, এবং এর পাতা বাদাম গাছের পাতার মত, তবে কিছু ছোট।

গুলের—গাছের গুঁড়িতে এই ফল ধরে। দেখতে ডুমুরের মত। ফল বিস্বাদ।

আমলে (আমলা)—এই ফলের পাঁচটা খাঁজ। না-ফোটা তুলোর সুটির মত এই ফল দেখতে। খেতে কটু। এই ফলের আচার তৈরী করলে খেতে মন্দ হয় না এবং উপকারিও বটে। গাছ দেখতে সুন্দর, পাতা ছোট ছোট।

চিরঞ্জি—এই গাছ পাহাড়ে জন্মে। ফলের শাঁস খুব সুস্বাদু। অনেকটা ওয়ালনাট ও বাদামের শাঁসের মত। পেস্তার চেয়েও এ ফল ছোট ও গোল। মিষ্টান্নে এর ব্যবহার আছে।

খেজুর—হিন্দুস্থানে এর বিশেষত্ব নাই। তবে এ ফল আমাদের দেশে নাই, এজন্য এর কথা লিখছি। লামঘানাতেও খেজুর গাছ দেখা যায়। খেজুর গাছের সমস্ত শাখা এক জায়গা থেকে বেরোয় অর্থাৎ গাছের মাথার দিক থেকে। শাখার দুই দিকেই ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত পাতা গজায়। গাছের গুঁড়ি অমসৃণ, রং বিশ্রী। খেজুর ফল আঙ্গুর গুচ্ছের মত, কিন্তু আকারে অনেকটা বড়। এখানকার লোক বলে উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক খেজুর গাছেরই প্রাণী জগতের সঙ্গে দুই বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। একটা হচ্ছে কোনও প্রাণীর মাথা কেটে ফেললে যেমন সে মরে, তেমনি খেজুর গাছের মাথা কাটলে এ গাছও বাঁচে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে—যেমন কোনও পুরুষ সংসর্গ না হলে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না তেমনি যদি পুরুষ খেজুর গাছের ডাল এনে স্ত্রীখেজুর গাছের ওপর না নাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ না হয় তাহলে গাছে ফল ধরেনা। এ কথা কতদূর সত্য তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না। খেজুর গাছের মাথার দিকটাকে মুথা বলে। সেই জায়গা থেকেই শাখা ও পাতা বের হয়। যখন পাতা সমেত পাখা বাড়তে থাকে তখন পাতা ক্রমশঃ বেশী সবুজ হতে থাকে। সাদা রংয়ের এই খেজুরের মুথা খেতে মিষ্টি। এর স্বাদের সঙ্গে অনেকটা আখরোটের স্বাদের সাদৃশ্য আছে। খেজুরের মাথার দিকে এখানকার

লোকেরা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে' সেই ছিদ্রের মধ্যে খেজুরের পাতা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেয় যে ভেতর থেকে যে রস নির্গত হয় তার সবটাই এর পাতা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে। মাটির হাঁড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে তার মুখে ঐ পাতাটা পূরে দেয় যাতে সব রসটা ঐ পাত্রে জমা হতে পারে। এই রস টাটকা খেলে বেশ মিষ্টি লাগে। যদি তিন চার দিন পর খাওয়া যায় তাহলে এতে মদের মত নেশা হয়। একবার যখন আমি চম্বল নদীর তীরে বারি সহরে (ঢোলপুর রাজ্যের একটি সহর) পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম সেই সময় আমাদের গমন পথে একটি উপত্যকায় এমন কতকগুলো লোক দেখতে পেয়েছিলাম যারা খেজুর গাছের রস দিয়ে মদ তৈরী করে। অমরা এই মদ অনেকটা পান করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কারও কোনও রকম মাতলামির ভাব হয়নি। সম্ভবত খুব বেশী পরিমাণে না খেলে কিছুই হয়না—কারণ এর মাদক গুণ খুবই অল্প।

নারগিল (নারিকেল)—আরববাসীরা বলে নারগিল আর হিন্দুস্থানীরা বিশ্রী উচ্চারণ করে বলে নালির (হিন্দুস্থানে এর চলতি নাম নাড়িয়াল)। নারিকেলের খুলি দিয়ে কালো রংএর চামচে তৈরী হয়। ঘিচেক নামে এক রকম বাদ্যযন্ত্রের (গিটার জাতীয়) খোল বড় নারিকেলের খুলি দিয়ে তৈরী হয়। নারিকেল গাছ অনেকটা খেজুর গাছের মত, কিন্তু এর পাতা খেজুর গাছের পাতার চেয়ে বড়, সংখ্যায় বেশী ও অনেক বেশী উজ্জ্বল রংয়ের। আখরোটের যেমন বাহিরের খোসা সবজে নারিকেলের ও তাই, তবে নারিকেলের ওপরের খোসা তন্তুময় পদার্থের। নারকেলের খোসা ছাড়িয়ে যে দড়ি তৈরী হয় তা দিয়ে জাহাজ অথবা নদীতে যে সব নৌকা চলে সেগুলো তীরে বাঁধার কাজ হয়। নারিকেলের দড়ি দিয়ে নৌকার পাটাতনের তক্তার জোড়ও বাঁধা হয়। ওপরের খোসা ছাড়িয়ে নিলে এর খুলির এক পাশে তিনটি ছিদ্রের মত দেখা যায় যা একটা ত্রিভুজের মত। দুইটি ছিদ্র শক্ত ভাবে বন্ধ. কিন্তু আর একটা বন্ধ থাকলেও নরম এবং একটু কষ্ট করে জোরে চাপ দিলে সেটা ফুটো হয়ে যায়। নারকেলের মধ্যে শাস হওয়ার আগে জলে পূর্ণ থাকে। সেই জলই ছেঁদায় মুখ লাগিয়ে এখানকার লোকেরা পান করে। এ কথাও বলা যায় যে নারকেলের শাসই গলিত অবস্থায় জলের আকারে থাকে।

তাল—তাল গছের শাখাও মাথার দিক থেকে বের হয়। খেজুর গাছে পাত্র বেঁধে যেমন রস আহরণ করা হয় তাল গাছ থেকেও সেই একই ভাবে রস সংগ্রহ করে এখানকার লোকেরা পান করে। তালের রসকে এরা 'তাড়ী' বলে।

খেজুরের রসের চেয়ে তালের রসের মাদকতা বেশী। তালের শাখার ওপরের দিকে এক কি দেড় গজের মধ্যে কোনও পাতা থাকে না। তারপর ত্রিশ চল্লিশটি পাতা এক সঙ্গে শাখার নীচ দিকে বের হয়, দেখতে ঠিক হাতের ছড়ানো আঙুল গুলোর মত। এই পাতা গজ খানেক লম্বা। হিন্দুস্থানীরা তাল পাতা কাগজের মত ব্যবহার করে। এই তাল পাতাতেই পুথি লেখে। এই দেশবাসীরা যখন কানে ধাতু নির্ম্মিত মাকড়ি পরে না, তখন তারা দুই কানের বড় বড় ছিদ্রের মধ্যে তালপাতার তৈরী মাকড়ি গুজে রাখে। তাল পাতার তৈরী এই জাতীয় আভরণ বাজারে বিক্রয় হয়। তাল গাছের গুঁড়ি খেজুর গাছের গুঁড়ির চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর এবং মসৃণ।

নারাং [কমলা]—নারাং ছাড়াও অনেক জাতের কমলা এখানে দেখা যায় লামঘানাতে, বাজুর ও সাওয়াদেও ভাল কমলা পাওয়া যায় এবং প্রচুর ফলে। লামঘানার কমলা আকারে ছোট কিন্তু খুব রসালো এবং তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে খুব উপাদেয়। এর গন্ধ মিষ্ট, স্পর্শে নরম এবং দেখতে সজীব। খোরাসানের কমলার সঙ্গে এ কমলার তুলনা হয় না। এর কমনীয়তা এমন যে লামঘানা থেকে কাবুলে নিয়ে যেতে—যার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাইল—রাস্তাতেই এই কমলা নষ্ট হয়ে যায়। আস্তারাবাদের কমলাও সমরকন্দে নিয়ে যাওয়া হয় —যার দূরত্ব প্রায় এগারশ মাইল—কিন্তু তার খোসা পুরু এবং রস কম হওয়ায় মোটেই তেমন ক্ষতি হয় না। বাজুরের কমলার আকার লেবুর মত। এগুলো খুব রসালো, কিন্তু অন্য জায়গার কমলার চেয়ে অম্লস্বাদ বেশী। খাজা কালান আমাকে একবার বলেছিল যে বাজুরে এই জাতীয় কমলা লেবুর একটা গাছের ফল পাড়িয়ে গুণে দেখেছিল যে সেই গাছের ফলের সংখ্যাই সাত হাজার। আমার মনে হয় নারাং কথাটা আরবি নারাঞ্জ কথারই অপভ্রংশ। বাজুর ও সাওয়াদের অধিবাসীরা নারাঞ্জকে নারাং বলে।

লেবু (বিহি)—লেবু এদেশে প্রচুর ফলে। আকারে মুরগীর ডিমের মত। গঠনেও প্রায় ঐ রকম। কেউ বিষদুষ্ট হলে অর্থাৎ কারও দেহে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পেলে লেবু গরম জলে সিদ্ধ করে তার আঁস খেলে বিষের ক্রিয়া দূর হয়।

তুরাঙ—কমলার মতই আর এক রকমের লেবু—নাম তুরাঙ (কলম্বী লেবু)। বাজুর ও সাওয়াদের লোকেরা একে বলে বালেং। এই লেবুর খোসা দিয়ে মোরব্বা তৈরী করলে তাকে বলা হয়—বালেং মোরব্বা। কলম্বী লেবুকে হিন্দুস্থানীরা বলে—বাজুরি। এই লেবু দুই জাতের হয়। এক জাতের লেবু পানসে,

অল্প মিষ্ট স্বাদ। খেতে মোটেই ভাল নয়, তবে এর খোসায় মোরব্বা তৈরী হয়। লামঘানাতের লেবু এই ধরণের। হিন্দুস্থান ও বাজুরের কলম্বী লেবু অম্লস্বাদের, কিন্তু এর সরবৎ হয় খুব সুস্বাদু ও আরামদায়ক। কলম্বী লেবু আকারে খরমুজের মত। এর ওপরের ছাল কর্কশ ও কোঁচকানো। এর প্রান্তভাগ সরু ও সুঁচালো। এই ফলের রং গাঢ় পীতবর্ণের। গাছের গুঁড়ি মোটা নয়। গাছ ছোট ছোট কিন্তু ঝাঁকড়া। কমলা লেবুর গাছের পাতার চেয়ে এর পাতা বড়।

সানতারা—এও এক রকমের কমলা লেবু। চেহারা ও বর্ণে কলম্বী-লেবুর মত, তবে এই ফলের ত্বক মসৃণ। মোটেই খসখসে নয়। ক্ষুদ্রাকারের কলম্বী লেবুর চেয়েও এগুলো ছোট। এর গাছ বেশ বড় হয়, প্রায় খুবানি গাছের মত। গাছের পাতা নারেঙের পাতার মত। এই লেবুর মিষ্ট-অম্ল স্বাদ। এর সরবৎ খেতে খুব ভাল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। লেবুর মতই এই ফল পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কলম্বী লেবুর মত অম্লুত্তেজক নয়।

কমলা জাতীয় আর এক ধরণের লেবু আছে যা দেখতে বড়। হিন্দুস্থানীরা একে বলে—কিল্ কিল্ লেবু। এর আকার হাঁসের ডিমের মত, কিন্তু দুই প্রান্ত ডিমের মত ছুচলো নয়। সান্‌তারার মতই এর ত্বক মসৃণ। এ লেবুতে রস খুব বেশী।

জামিরি (জম্বুরা, বাতাবি লেবু]—এর গঠন কমলার মত, কিন্তু রং গাঢ় পীতবর্ণ। এর গন্ধ কমলা লেবুর মত হলেও এ কমলালেবু নয়। এর স্বাদ—মিষ্ট-অম্ল।

সাদা ফল [মুসুম্বি ?]—এও এক রকম কমলাজাতীয় ফল, আকারে ন্যাসপাতির মত, খেতে মিষ্ট, কিন্তু কমলার মত হৃদ্যকারজনক মিষ্ট নয়।

অম্রৎ ফল—এ ফলও কমলা জাতীয়। [তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মচরিতের কপিতে সম্রাট হুমায়ুনের নিম্নলিখিত মন্তব্য লেখা আছে যা ফারসী ভাষার কোনও অনুবাদে দেখা যায় নি। মন্তব্যটি এই—পরলোকগত বর্ত্তমানে স্বর্গবাসী মহান সম্রাট—খোদা তাঁর গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। অম্রত ফল সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট রকম পর্য্যবেক্ষণ করেন নি। তিনি বলেছেন—এই ফল মিষ্ট হলেও স্বাদে পানসে এবং এর সঙ্গে কমলা লেবুর তুলনা করেছেন ও এই ফল তাঁর ভাল লাগেনি বলেছেন। তিনি বরাবরই কমলা লেবু পছন্দ করতেন না। অম্রত ফলের মৃদু অম্ল-মিষ্ট স্বাদের জন্য এখানকার সকলেই এই ফলকে কমলালেবুর মত বলতো। এই সময়ে বিশেষ করে যখন তিনি প্রথমবার হিন্দুস্থানে আসেন, তখন

তাঁর সুরাপান করার অভ্যাস ছিল। সেই জন্য তিনি কোনও মিষ্ট রসের জিনিষ পছন্দ করতেন না। আম্রত ফল সত্যই খেতে চমৎকার। এর রস উগ্র মিষ্ট না হলেও খেতে খুব ভাল। পরবর্ত্তীকালে আমরা এই ফলের প্রকৃতি ও উৎকর্ষ আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। অপক্ক অবস্থায় এই ফলের অম্লস্বাদ কমলা লেবুর মত। এই অম্লস্বাদ পাকস্থলী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে এই ফল পাকে তখন খুব মিষ্টি হয়]।

বঙ্গদেশেও এই জাতীয় দুই রকম অম্লগন্ধী ফল আছে আম্রত ফলের উৎকর্ষতার সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে।—এর একটির নাম কামলা (কমলা) —যা আকারে নারাং এর সমান। অনেকে একে বড় লেবু বলে কিন্তু লেবুর চেয়েও এ ফল ভাল। এ ফল দেখতে জমকালো নয় এবং আকারেও বড় নয়। আরও এক জাতের ফল হচ্ছে সানতারা। এগুলোর আকার কিছু বড় কিন্তু অম্ল নয় এবং আম্রত ফলের ন্যায় বিস্বাদও নয়—তবে খুব মিষ্টও নয়। সত্যিই সান্তারার মত ভাল ফল দুর্লভ। এ ফলের আকার সুন্দর এবং খাদ্য হিসাবে স্বাস্থ্য প্রদ। এই ফল পাওয়া গেলে লোকে এ ফল ছেড়ে অন্য ফলের কথা মনে করে না এবং খেতেও আকাঙ্খা করে না। এর খোসা হাত দিয়ে ছাড়ানো যায়। যত গুলিই তুমি খাওনা কেন তোমার তৃপ্তি মিটবে না। তোমার মন আরও চাইবে। এই ফলের রসে হাত ময়লা হয় না। ভেতরের কোমলাংশ থেকে সহজেই এর কোয়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। আহারের পর এই ফল খাওয়া চলে। এই জাতের সান্তারা খুব কমই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের স্বর্ণগ্রাম নামে এক পল্লীতে এই ফল ফলে এবং স্বর্ণগ্রামেরও বিশেষ এক জায়গার মাটিতে এই বিশেষ গুণসম্পন্ন ফলের গাছ দেখা যায়। মোটের ওপর এই শ্রেণীর নানা ফলের মধ্যে বাংলার সান্তারার মত উপাদেয় আর কোনও ফল নাই—এমন কি অন্য কোনও ফলের সাথেও বাস্তবিক পক্ষে এর তুলনা হয় না।

কিরণে—এও কমলা জাতীয় ফল। আকারে কিলকিল লেবুর মত এবং অম্ল স্বাদবিশিষ্ট।

আমিলবিদ্—এ ফলও কমলা জাতীয়। আমি এই ফল প্রথম দেখি বর্ত্তমান বৎসরে—ভারতে আগমনের তিন বৎসর পর ১৫২৯ সালে। (সম্ভবতঃ বাবর তাঁর আত্মকথার এই অধ্যায় এই বৎসর লেখেন।) এখানকার লোকেরা বলে—যদি এই ফলের গায়ে সূচ বেঁধানো হয় তাহলে সমস্ত ফলটাই গলে যায়। এই ফলের অম্ল গুণ খুব বেশী অথবা অন্য কোনও বিশেষ গুণের আধিক্যের জন্য সম্ভবতঃ এই রকম হয়ে থাকে। এর অম্লভাব অনেকটা কমলা এবং লেবুর মত।

হিন্দুস্থানের ফুল

হিন্দুস্থানে অনেক রকম ফুল আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে—

জাগুন (জবা ?)—হিন্দুস্থানীদের অনেকে আবার এই ফুলকে বলে গুরহাল। যে গুল্মের ওপর এই ফুল হয় সেটা লম্বা। রক্ত গোলাপের ঝোপের চেয়ে এর ঝোপ বড় হয়। এই ফুলের রং ডালিমের রংয়ের চেয়েও গভীর লাল। আকারে এই ফুল প্রায় রক্ত গোলাপের সমান। রক্ত গোলাপের কুঁড়ি একবারেই ফুটে ওঠে, কিন্তু জাগুন ফুল ধীরে ধীরে পাঁপড়ি মেলে। প্রথমে কোরকের দিক একটু উন্মীলিত হয়ে মধ্যের হৃদপিণ্ড দৃষ্টি গোচর হয়, তারপর ক্রমশঃ গোটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যদিও এই ফুলের অন্তর ও বহিরভাগ একই ফুলের অংশ, তবুও দেখে মনে হয় যেন আলাদা। কারণ, এই ফুলের মধ্য দিয়ে একটা সরু শুঁড়ের মত বেরিয়ে আসে যা লম্বায় প্রায় এক বিঘতের মত এবং এই বৃন্ত ঘিরে পাঁপড়িগুলো ফুটতে থাকে যা অপূর্ব্ব দেখায়। প্রস্ফুটিত ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল। তবে এ ঔজ্জল্য বেশী সময় থাকেনা, এক দিনেই মলিন হয়ে যায়। বর্ষাকালের চার মাস এই ফুল গাছ আলো করে থাকে। অবশ্য বার মাসই এই ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালের মত অজস্র নয়।

কানির (করবি ?)—এই ফুল সাদা ও লাল দুই রংয়েরই হয়। পীচের ফুলের মত এই ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি। লাল রংয়ের কানির দেখতে ঠিক পীচ ফুলের মত, তবে চোদ্দ পনরোটা কানির ফুল এর জায়গাতেই ফোটে তাই দূর থেকে মনে হয় যেন একটা বড় ফুল। এই ফুল গাছের ঝোপ জাগুন গাছের ঝোপের চেয়ে বড়। লাল কানিরের গন্ধ মৃদু হলেও ভাল। এই ফুলও বর্ষাকালে তিন চার মাস অজস্র ফোটে। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময়ই এই ফুল দেখা যায়।

কেওরা—এই ফুলের গন্ধ খুব মিষ্টি। আরববাসীরা এই ফুলকে বলে—'কারি'। কস্তুরি ফুলের দোষ এই যে তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে—সেইজন্য একে ভিজে কস্তুরি ফুলও বলা যায়। এই ফুলের আকৃতি এক বিশেষ ধরণের। কস্তুরি ফুল আকারে এক দেড় বিঘত, কখনও কখনও দুই বিঘত ও দেখা যায়। এই ফুলের পাতা ঘেরু (এক জাতীয় গোলাপ) ফুলের মত লম্বা। গোলাপ কুঁড়ির মত এই ফুলেও কাঁটা আছে। এই ফুল ফুটতে যখন দেরী থাকে তখন এর বাইরের পাঁপড়ি থাকে সবুজ, আর ভেতরের পাঁপড়ি সাদা ও নরম। পাঁপড়িগুলির মধ্যে একটি স্তবক মনে

হয় যেন ফুলের হৃদপিণ্ড। এর গন্ধ সত্যিই খুব মধুর। এই ফুল দেখতে মনে হয় যেন একটা ছোটখাট ফুটন্ত ঝোপ, যার গুড়ি যেন এখনও বড় হয়নি। ফুলের পাতা বেশ চওড়া এবং কণ্টকময়। গাছের গুঁড়ি দেখতে সামঞ্জস্যহীন। গুঁড়ি থেকে একটা ডাঁটা ওঠে, সেই ডাঁটায় ফুল ফোটে।

চামেলি—এ ফুল আমাদের দেশের জুঁই ফুলের চেয়ে বড়, গন্ধও তীব্রতর।

হিন্দুস্থানের ঋতু

অন্য দেশে চারটি ঋতু—কিন্তু হিন্দুস্থানে তিনটি। বছরের চারমাস বর্ষা ও চারমাস শীত। নয়া চাঁদ থেকে এর মাস সুরু হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর এরা বর্ষা ঋতুর সঙ্গে এক মাস যোগ করে, আবার তার তিন বছর অন্তর একমাস যোগ করে শীত ঋতুর সঙ্গে এবং তার তিন বছর পর একমাস যোগ করে গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে। এদের ঋতু গণনার পদ্ধতি এই। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় হচ্ছে গ্রীষ্ম ঋতুর মাস অর্থাৎ মীন, মেষ, বৃষ, ও মিথুন রাশির মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক হচ্ছে বর্ষা ঋতুর মাস অর্থাৎ কর্কট, সিংহ, কন্যা ও তুলা রাশির মাস। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন হচ্ছে শীত ঋতুর মাস অর্থাৎ বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ রাশির মাস। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা যদিও এক একটা ঋতু চারমাস করে ধরে, কিন্তু যে দুই মাসে সেই ঋতুর প্রাবল্য বেশী সেই মাস দুইটিকেই সেই ঋতুর মাস অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের মাস বলে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দুই মাস—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়কে অন্য দুইমাস থেকে পৃথক করে নিয়ে বলে গ্রীষ্মকাল, বর্ষা ঋতুর প্রথম দুই মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্রকে বলে বর্ষাকাল। শীত ঋতুর মাঝের দুই মাস অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ মাসকে বলে শীতকাল। এই নিয়মে এখানকার ঋতু প্রকৃতপক্ষে ছয়টি।

হিন্দুস্থানের সপ্তাহ

হিন্দুস্থানীরা সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ করেছে—শনিচর (শনিবার) এতোয়ার (রবিবার), সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

সময়-বিভাগ

আমাদের দেশের 'কিচা গুন্দুজ' (তুর্কি) কথার মত এখানেও 'দিনরাত' এই কথা চলতি। আমাদের দেশের মত এখানকার দিনরাতও চব্বিশ ভাগে বিভক্ত—এক একভাগ এক এক ঘণ্টা আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগ

এক মিনিট অর্থাৎ গোটা দিনরাত ১৪৪০ মিনিটের সমষ্টি। হিন্দুস্থানীরা দিন-রাতকে ৬০ ভাগেও ভাগ করে থাকে—এক এক ভাগ হচ্ছে এক এক ঘড়ি। তারা আবার রাতকে চার ভাগে এবং দিনকে চারভাগে ভাগ করে—এক এক প্রহর, ফারসিতে যাকে বলে 'পাস্'। আমাদের দেশেও প্রহর ও প্রহরী (পাস্‌ উ-পাস্‌বান) আছে কিন্তু তাদের বিবরণ আলাদা। হিন্দুস্থানের অনেক সহরে প্রহর ঘোষণার জন্য 'ঘড়িয়ালি' (ঘড়ি পেটানোর লোক) নিযুক্ত করা হয়। দুই ইঞ্চি পুরু একখানা বড় পিতলের থালার মত পাত্র যাকে বলা হয় 'ঘড়িয়াল' —সেটাকে উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সময় ঠিক করার জন্য এদের আর একটা পাত্র থাকে যার তলায় ফুটো। সেই পাত্রটি জলে বসিয়ে রাখলে এক ঘড়িতে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে পূর্ণ হয়ে যায়। 'ঘড়িয়লিরা' এই পাত্র জলে বসিয়ে রাখে এবং যতক্ষণ না এ পাত্র পূর্ণ হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক ফুটো পাত্র জলে রাখে। যখন এই পাত্র প্রথম পূর্ণ হয় তখন ছোট একটা কাঠের মুগুর দিয়ে ঝুলানো ঘড়িতে একবার আঘাত করে। দ্বিতীয়বার যখন এই পাত্র পূর্ণ হয়—তখন ঘড়িতে আঘাত করে দুইবার, এই ভাবে যতক্ষণ না সেই প্রহর শেষ হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। এক প্রহর-শেষ হওয়ার পর তারা খুব দ্রুত কয়েকটি ঘা মারে ঘড়িতে —তারপর একটু থেমে যদি প্রথম প্রহর শেষ হয় তাহলে একটা, দ্বিতীয় প্রহর হলে দুইটা, তিন প্রহর অতীত হলে তিনটা এবং চতুর্থ প্রহর অতিবাহিত হলে চারটা ঘা মারে। দিনের চার প্রহর শেষ হয়ে রাতের প্রহর আরম্ভ হলেও একই ভাবে সময় নির্দেশ করা হয়। এখানকার নিয়ম ছিল এই যে প্রহর শেষ হলে তবেই সেই প্রহরের সঙ্কেত জানানো হতো। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল এই যে রাতে যে সব লোক ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে ঘড়ি পেটার শব্দ শুনতো এবং ঘড়িতে তিন বা চারবার আঘাতের শব্দ শুনলে তাদের বোঝবার পক্ষে অসুবিধে হতো—যে এটা রাতের কোন প্রহরের ঘণ্টা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরের। আমি সেইজন্য নির্দেশ দিই যে রাত্রে কিংবা মেঘলা দিনে ঘড়ির সঙ্কেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরের সঙ্কেতও জানাতে হবে—যেমন প্রথম নৈশ প্রহরের তিন ঘড়ি বাজানোর পর ঘড়িয়ালিদের একটু থেমে সেই প্রহরের সঙ্কেত বাজাতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে এই তিনঘড়ি হচ্ছে প্রথম নৈশ প্রহরের। অনুরূপ-ভাবে তৃতীয় নৈশ প্রহরের চার ঘড়ি বাজানোর পর একটু থেমে তৃতীয় প্রহরের সঙ্কেত ধ্বনি করতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে তৃতীয় নৈশ প্রহরের, চার

ঘড়ি বাজলো। এই নিয়মের ফল খুব ভাল হয়। কেউ রাতে জেগে উঠে ঘড়ি পেটা শুনলে বুঝতে পারে কোন প্রহরের কত ঘড়ি বাজছে।

আবার, এখানকার লোকেরা এক ঘড়িকে ৬০ ভাগে ভাগ করে। এক এক ভাগকে বলে পল। (তালিকা এইরূপ—৬০ বিপল=১ পল, ৬০ পল=১ ঘড়ি (২৪ মিনিট), ৬০ ঘড়ি বা আট প্রহর=এক দিন রাত)। এই নিয়মে দিন ও রাত ৩৬০০ পলের সমষ্টি। (পল সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য—এখানকার লোকে বলে—চোখের পাতা ৬০ বার বন্ধ করতে ও খুলতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু হবে পল অর্থাৎ এইভাবে ২,১৬,০০০ বার চোখের পাতা বন্ধ করলে ও খুললে হয় এক দিনরাত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এক পল সময়ে আটবার 'কুল হুয়া আল্লা' ও 'বিসমিল্লা' অর্থাৎ দিনরাতে এইভাবে ২৮,০০০ আবৃত্তি করা যায়।

পরিমাপ পদ্ধতি

হিন্দুস্থানে সুশৃঙ্খল পরিমাপের নিয়ম আছে। যথা—৮ রতি=এক মাসা, ৪ মাসা=১ টাক=৩২ রতি, ৫ মাসা=১ মিশকাল=৪০ রতি, ১২ মাসা=১ তোলা=৯৬ রতি, ১৪ তোলা=১ সের।

সর্ব্বত্রই এই মাপ চলতি—৪০ সের=১ মানবন ১২ মানবন=১ মানি। ১০০ মানির ওজনকে এরা বলে মিনাসা।

মুক্তা ও জহরতের মাপ হয় টাক দিয়ে।

গণন পদ্ধতি

হিন্দুস্থানের গণনার পদ্ধতিও খুব ভাল। এরা ১০০০০০ কে বলে এক লাখ। ১০০ লাখকে এক কোটি। একশ কোটিকে এক অর্ব্বুদ। একশ অর্ব্বুদকে এক কুর্ব। ১০০ কুর্বকে ১ নীল। ১০০ নীলকে এক পদম্ (পদ্ম)। ১০০ পদমকে এক সাং [শঙ্খ?]। এই রকম উচ্চ গণনা সংখ্যাতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দুস্থানে কিরূপ ঐশ্বর্যশালী।

হিন্দুস্থানের অধিবাসী

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বিধর্ম্মী। এই বিধর্ম্মীদের হিন্দু বলা হয়। অধিকাংশ হিন্দুই মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে। এখানকার সমস্ত কারুশিল্পী, মজুর ও কর্ম্মচারী হিন্দু। আমাদের দেশের যারা অরণ্যে বাস করে অথবা

যাযাবর, তাদেরই উপজাতীয় নাম আছে। কিন্তু এখানে যাদের কৃষিজমি আছে এবং পল্লীতে স্থায়ী বাস তাদের জাতের নাম আছে (সম্ভবতঃ হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের জাতের নাম)। আবার এখানকার প্রত্যেক কারিগর তাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার চালায়।

হিন্দুস্থানের দোষবিচার

হিন্দুস্থানে এমন কোনও আনন্দ দায়ক ব্যাপার নাই যার প্রশংসা করা যেতে পারে। এখানকার অধিবাসীরা মোটেই সুশ্রী নয়। তাদের আকর্ষণীয় কোনও সামাজিক সখ্য ভাব নাই, পরস্পর বন্ধুর মত মেলা মেশার অভ্যাস নাই, অথবা একতা বদ্ধ হয়ে আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার রীতি নাই। তাদের না আছে কোনও বিষয়ে প্রতিভা, না আছে মনের স্থৈর্য্য, না আছে ব্যবহার শিষ্টতা, না আছে দয়া অথবা বন্ধুপ্রীতি। তাদের না আছে নব নব যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্ষমতা, না আছে হস্ত শিল্পের সাধনা এবং কাজে তার প্রতিফলন, না আছে স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞান ও নৈপুণ্য। তাদের ভাল ঘোড়া নাই, খাওয়ার ভাল মাংস নাই। আঙ্গুর কিংবা খরমুজ নাই কোনও ভাল ফল নাই। বরফ নাই, শীতল জল নাই, তাদের বাজারে ভাল খাদ্য ও রুটি নাই। কোনও স্নানশালা অথবা উচ্চ শিক্ষায়তন নাই, আলোর জন্য মোমবাতি নাই।

মোমবাতি অথবা মশালের স্থান অধিকার করে আছে একদল নোংরা লোক—যাদের বাঁ হাতে ধরা থাকে একটা ছোট তেপায়া কাঠের পাত্র, তার এক কোণায় মোমবাতির মাথার দিকের মত একটা জিনিষ বসানো—তাতে বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা একটা পলতে। তাদের ডান হাতে থাকে একটা লাউয়ের খোল তার নীচে একটা ছোট ছ্যাদা, সেই ছ্যাদার ভিতর একটা সরু সুতো। সেই সুতোর মধ্যে দিয়ে টপ টপ করে তেল ঝরে পড়ে বাঁ হাতে ধরা পাত্রের পলতের ওপর, যখনই সেই পলতেয় তেলের দরকার হয়। এখানকার ধনী লোক এই রকম একশ, দুশ বাতিওয়ালা রাখে। প্রদীপ আর মোমবাতির পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা হিন্দুস্থানে এই প্রকার। এখানকার শাসক ও আমিরদের যদি রাতে কাজ থাকে এবং আলোর দরকার হয়—তা হলে এই সব নোংরা বাতি-ওয়ালা এই ধরণের বাতি নিয়ে তাদের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

এখানে নদী এবং হ্রদ ছাড়াও কতকগুলো খাদ ও গর্ত্ত আছে, যাতে জল পাওয়া যায়। এদের উদ্যানে এবং প্রসাদে জল নিয়ে আসার জন্য কোনও

নালার ব্যবস্থা নাই। এদের বসত বাড়ী শ্রীহীন, তাতে হাওয়া খেলেনা এবং কোনও রকম শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য নাই।

এখানকার কৃষক এবং দরিদ্র লোকেরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে। ল্যাঙ্গট নামে একটা জিনিস যা দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করে সেটা দুই বিঘত পরিমাণ একটা ন্যাকড়া যা নাভির নীচে দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। আর একটা ন্যাকড়ার ফালি তার সঙ্গে জুড়ে দুই উরুর মাঝ দিয়ে পেছনের দিকে টেনে তুলে কোমরের বাঁধনের সঙ্গে আটকে রাখে। স্ত্রীলোকেরা ও একটা কাপড় কোমরে বাঁধে, যার অর্দ্ধেকটা থাকে কোমরে বেড় দেওয়া—আর অর্দ্ধেকটা মাথার ওপর ফেলা।

হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য

হিন্দুস্থানের বিশেষ গুণ এই যে দেশটা বিশাল এবং এখানে সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য খুব বেশী। বর্ষাকালে এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। সে সময় কোনও কোনও দিন পনরো এমন কি কুড়িবার পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়। বর্ষা ঋতুতে এমনভাবে প্লাবন নেমে আসে যে নদী পূর্ণ হয়ে যায় এবং যেখানে অন্য সময় জল থাকে না সে সব জায়গাও জলে পূর্ণ হয়ে যায়। মাটি ক্রমাগত বৃষ্টির জলে ভিজে ওঠায় আবহাওয়া হয়ে ওঠে তৃপ্তিকর। এই সময়কার শীতোষ্ণ আরাম-দায়ক কোমল তাপ মাত্রার সত্যই তুলনা হয় না। কিন্তু এর দোষ এই যে হাওয়ায় একটা ভিজে স্যাঁৎসেতে ভাব থাকে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা যায় না। তীর ধনুক অকেজো হয়ে পড়ে। শুধু তীর ধনুকই নয়—বর্ম্ম, বই, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সব তাতেই এই স্যাঁৎসেঁতে ভাবের মন্দ প্রভাব দেখা যায়। এখানকার বাড়ীঘরও মজবুতভাবে তৈরি না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষা ঋতুর মত শীত ও গ্রীষ্মেও ভাল আবহাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যখন উত্তুরে হাওয়া বয় তখন সেই হাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ধূলোমাটি উড়তে থাকে। বর্ষা ঋতুর সূচনার কিছুদিন আগে পাঁচ ছয় বার এই রকম হাওয়া প্রবল বেগে বইতে থাকে। সেই সময় এমন ধুলো বালি উড়তে থাকে যে কাছের লোককেও চোখে দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা একে বলে আঁধি। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য যখন বৃষ এবং মিথুন রাশিতে, সেই সময় এখানে তাপ বৃদ্ধি হয়—কিন্তু এমন গরম তখন হয়না যে অসহ্য হয়ে ওঠে। বাল্‌খ এবং কান্দাহারের গরমের সঙ্গে এই গরমের তুলনা হয় না। এখানকার গরম ঐ দেশগুলির গরমের অর্দ্ধেকও নয়।

হিন্দুস্থানের আর একটি সুবিধা হচ্ছে এই যে এখানে প্রতিটি কাজ ও ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর লোক পাওয়া যায়। প্রত্যেক কাজ এবং চাকুরির জন্য সব সময়েই এক এক দল লোক প্রস্তুত হয়ে থাকে—যাদের পূর্ব্বপুরুষরা সেই কাজ বা ব্যবসা পুরুষানুক্রমে করে এসেছে। মোল্লা সেরিফ উদ্দিন আলি ভেজদির তাঁর জাফর নামায় এক অদ্ভুত কথা লিখেছেন। যখন তাইমুর বেগ পাথরের মসজিদ তৈরী করেন তখন আজির বাইজান, হিন্দুস্থান ও অন্যান্য নানা দেশ থেকে তিনি পাথর কাটার জন্য মজুর নিয়ে আসেন এবং দৈনিক দুই'শ মজুর এই মসজিদ তৈরীর কাজে খাটে। একমাত্র আগ্রতেই আমার প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য সেই জায়গা থেকেই দৈনিক ছয়শ আশি জন মজুর নিযুক্ত করি। আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কোয়েলে (আলিগড়) আমার কাজের জন্য দৈনিক এক হাজার চারশ একানব্বই জন পাথর কাটার লোক নিযুক্ত হয়। এই ভাবে অন্য কাজ ও ব্যবসার জন্য অসংখ্য কর্ম্ম-দক্ষ লোক হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়।

রাজস্ব

বেরহে থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশগুলি আমার সাম্রাজ্যর অধীনে আসায় [বেহার বাবরের অধিকারে আসে ১৫২৯ সালে] সাম্রাজ্যের রাজস্ব দাঁড়ায় ৫২ কোটি টাকা। আট, নয় কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী কতকগুলি পরগণা সেখানকায় রাজা ও রহিস্‌রা বহুকাল থেকে ভোগ করে থাকেন সম্রাটের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের জন্য।

*　　　*　　　*

রজব মাসের ২৯ শে তারিখ শনিবার আমি কোষাগারের অর্থ পরীক্ষা করে ধন বিতরণ করতে আরম্ভ করি। কোষাগার থেকে সত্তর লক্ষ টাকা হুমায়ুনকে দিই। এ ছাড়া তাকে দিই একটা প্রাসাদ যার আসবাবপত্রের কোনও তালিকা করা হয়নি। কোনও কোনও আমিরকে দশলক্ষ টাকা, কাউকে বা আট লক্ষ, সাত লক্ষ বা ছয় লক্ষ টাকা দান করি। আফগান, হাজরাস, আরব, বেলুচি এবং অন্যান্য দেশের লোক যারা আমার সৈন্যদলে ছিল তাদের পদমর্য্যাদাও গুণানুসারে কোষাগার থেকে অর্থদান করি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী, প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি এক কথায় প্রতিটি লোক যারা আমার সঙ্গে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল তাদের এমন অর্থ উপহার দিই যা তাদের, সৌভাগ্যের

দ্যোতক বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কাবুলের অধিবাসীদের উৎসাহদানের জন্য নারী ও পুরুষ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, শিশু কিংবা বৃদ্ধ প্রত্যেককে দান স্বরূপ একটি করে মুদ্রা পাঠিয়ে দিই।

আমি যখন আগ্রায় আসি তখন গ্রীষ্ম ঋতু। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখানকার সমস্ত অধিবাসী পালিয়ে যায়। সেইজন্য এখানে কোনও খাদ্য শস্য কিংবা পশু-খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—যা দিয়ে আমাদের কিংবা অশ্বদের আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। গ্রামগুলিও আমাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণার জন্য বিদ্রোহী হয়ে চুরিডাকাতি সুরু করে দেয়। রাস্তায় চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোষা-গারের অর্থ বিলি করার পর এমন অর্থ ছিল না যাতে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে নানা পরগণা এবং বিশিষ্ট জায়গাগুলি রক্ষা করতে পারি। এ বছর এমন অসাধারণ গরম যে তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে। মরুভূমিতে লু লেগে যেমন লোক মারা পড়ে তেম্নি অনেক লোক সর্দি-গরমিতে মরতে লাগলো।

এই সব কারণে আমার দলের যে সব বেগ এবং বাছাই করা অনুচর মনের বল হারিয়ে ফেলে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তারা হিন্দুস্থান ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগল। বয়স্ক বেগরা যারা সত্যই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ কেবল তারাই যদি এইরূপ অভিপ্রায় জানাতো তাতে সত্যই কিছু দোষের ছিল না। কারণ তাদের এইরূপ ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পেলে আমার নিজস্ব বুদ্ধির ওপর আমার এমন আস্থা আছে যে সেই বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিবেচনা করে তাদের মতামতের ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। কিন্তু তাদের একই কাহিনী নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বারংবার আবৃত্তি করে এমন লোককে শোনানো হচ্ছে—যে লোক নিজের চোখেই সমস্ত ব্যাপার দেখছে এবং যে নিজেই সে ব্যাপারে বিবেচনা করে একটা ধীরস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এটা কি রকমের শালীনতা যে সৈন্যদলের শেষ সেনাটি পর্য্যন্ত এই রকম বুদ্ধিহীন কাঁচা রকমের মতবাদ প্রকাশ করতে পারে? এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে যখন আমি কাবুল থেকে যাত্রা করি শেষবারের মত, তখন নীচু থাকের অনেক লোককেও সম্মানজনক বেগের পদবীতে উন্নীত করে এই ধারণা করেছিলাম যে তারা আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করবে এবং আমি যদি জলে কিংবা আগুনে প্রবেশ করার পথই বেছে নিই তাহলে তারাও আমাকে অকুণ্ঠচিত্তে সেই পথেই অনুসরণ করবে এবং আমি যে পথে অগ্রসর হব তারাও সন্তুষ্টচিত্তে সেই পথেই এগিয়ে

আসবে। এটা আমার কখনই কল্পনায় আসেনি যে তারাই আমার কার্য্যের জন্য জবাব দিহি করবে এবং যারা আমার যে সব কার্য্যে ও অভিপ্রায়ে সম্মিলিত-ভাবে সভার ও মন্ত্রণা পরিষদে সমর্থন জানিয়েছিল তারাই এখন বেঁকে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধতার কথা ঘোষণা করবে। কাবুল থেকে বেরিয়ে আসার পর ইব্রাহিমকে যুদ্ধে পরাজিত করে আগ্রা দখল করার সময় পর্য্যন্ত খাজা কিলান প্রশংসা-জনক ব্যবহার করেছে। সে সর্ব্বদা বীরের মত কাজ করেছে এবং বীরের মতই তার মতামত ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আগ্রা দখল করার কয়েক দিনের মধ্যেই তার সমস্ত মতামতের আমুল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। সকলের চেয়ে খাজা কিলানই এখন ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্পে স্থির হয়ে রইলো।

আমার সৈন্যদলের মধ্যে ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে আমার সমস্ত বেগকে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হতে ডাকলাম। আমি তাদের বল্লাম যে যুদ্ধ জয় এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের মত কাজ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাদল ছাড়া হয় না। রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না—যদি প্রজা বা অধীনস্থ প্রদেশ না থাকে। অনেক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায়, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ কষ্টকর পথ অতিক্রম করে, নানাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে এবং আমার সৈন্যদলকে নানা ঘোরতর বিপদের অবস্থার মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের ফলে আল্লার অসীম অনুগ্রহে পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে আমি অসংখ্য প্রদেশ ও রাজ্য জয় করেছি এবং সেগুলো এখন অধিকার করে আছি। এখন এমন কি ব্যাপার ঘটে গেল, এমন কি দুঃখকষ্ট আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে যে যে রাজ্য আমরা নিজেদের শক্তিক্ষয় করে জয় করেছি সেই বিজিত রাজ্য বিনা কারণে পরিত্যাগ করে হতাশা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আবার কাবুলে ফিরে যাব? যে কেউ আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে সে যেন কখনই এমন প্রস্তাব আমার কাছে উত্থাপন না করে। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে কিছুতেই এখানে থাকবার কথা মেনে নিতে ও এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক নয় সে চলে যাক। আমার এই যুক্তি-সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ প্রস্তাব শোনার পর বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট সৈন্যদল তাদের রাজদ্রোহকর প্রস্তাব ত্যাগ করলো। খাজা কিলান থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ঠিক হলো যে তার অধীনে অনেক সৈন্য থাকায় সে কাবুলের জন্য আমার উপহারগুলি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাবুল ও গজনিতে আমার সৈন্য

সংখ্যা খুব অল্প থাকায় আমি তাকে এই নির্দেশ দিই যে এই জায়গাগুলো যেন ঠিকভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং যেন খাদ্যসম্ভারের কোনও অপ্রতুল না হয়। গজনির শাসন ভার আমি তার উপর অর্পণ করি—যার রাজস্ব বাৎসরিক তিন লক্ষ মুদ্রা। খাজা কিলান হিন্দুস্থানের প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে তার যাওয়ার সময় দিল্লীর কতকগুলি বাড়ীর দেওয়ালে এই কবিতাটি লিখে রেখে যায়ঃ—

(তুর্কিতে)

'নিরাপদে যদি সিন্ধু
হাতে পারি পার।
এইমুখো আর কভু
হবো নাকো আর।
হিন্দে ফিরিতে যদি
পুনঃ ইচ্ছা হয়।
লজ্জায় আমার যেন
মাথা কাটা যায়।'

যখন আমি হিন্দুস্থানে সশরীরে বর্তমান তখন এরূপ একটি কবিতা রচনা করে প্রকাশ করা প্রত্যক্ষভাবে অসৌজন্যের লক্ষণ। আমাকে ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প আমার ক্ষোভের কারণ হয়েছিল—কিন্তু তার এই আচরণ তার অপরাধ দ্বিগুণ করে দিল। আমি কোনও রকমে প্রস্তুত না হয়েই তাড়াতাড়ি একটি কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

(তুর্কিতে)

'বাবর! আল্লার অসীম দয়া তোমার উপর।
হও নতশির শত শত বার উদ্দেশ্যে তাঁহার।
সিন্ধ, হিন্দ, আরও রাজ্য, যিনি করেছেন দান,
গ্রীষ্মের অসহ্য তাপে তাঁর দয়া হবে কি বিস্মরণ?'
গরমে অস্থির হয়ে ভাব যদি শীতল স্থানের কথা,
ভাব একবার গজনির অসহ্য শীত তুষারের ব্যথা।'

সাওয়াল উৎসবের কয়েক দিন ধরে সুবৃহৎ হল ঘরে একটা বড় রকমের ভোজের আয়োজন হয়। সুতরাং ইব্রাহিমের নিজস্ব প্রাসাদের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-গোলাকার ছাদের নীচে চার দিকে পাথরের স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত এই বিশাল কক্ষে এই উপলক্ষে

স্বর্ণখচিত শাল, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং সোনার জিন সহ ঘোড়া আমি হুমায়ুনকে উপহার দিই। চিন্‌ তাইমুর ও মহম্মদ সুলতানকে স্বর্ণখচিত শাল, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং ছোরা দিই। অন্যান্য বেগ ও কর্ম্মচারীদেরও পদমর্য্যাদানুযায়ী দেওয়া হয় কোমর বন্ধ সহ তরবারি, ছোরা এবং সম্মান জনক পোষাক। মোটের উপর সেদিন একটি জিন সহ ঘোড়া, কোমরবন্ধ সহ দুই জোড়া তরবারি, মিনা করা ২৫ টি ছোরা, বহুমূল্য পাথর খচিত দুইখানি ছোরা এবং আঠাশটি পোষাক উপহার দেওয়া হয়। এই ভোজের দিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। এই দিন তেরবার বৃষ্টিপাত হয়। যারা বাইরে বসেছিল তারা সম্পূর্ণ ভাবে ভিজে যায়।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে হিন্দুস্থানের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে কৃত্রিম জলাধারের অভাব। সঙ্কল্প করলাম—যে জায়গা আমি বাস করবার জন্য নির্ব্বাচন করছি সেখানেই কৃত্রিম জলাশয়, জল আনবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র তৈরীর বন্দোবস্ত করব। আমার আগ্রায় আসার কয়েকদিন পরই স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে যমুনা পার হয়ে যাই এবং ঐ দিকটা পরীক্ষা করে দেখতে থাকি যে জায়গাটা উদ্যান রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র কিনা। কিন্তু সমস্ত জায়গাই এমন কুশ্রী ও ন্যক্কারজনক যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার যমুনা পার হয়ে ফিরে আসি। সৌন্দর্য্যের অভাব এবং দেশের অসন্তোষজনক পরি প্রেক্ষিতে আমার উদ্যান রচনার কল্পনাকে ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু আগ্রার কাছাকাছি কোনওরূপে একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়ায় যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, তারই সদ্ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

প্রথমে একটি বড় ইঁদারা খনন করে স্নানাগারে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করি। তারপর যে ভূমিখণ্ডে তেঁতুল গাছ এবং আট কোণ বিশিষ্ট জলাশয় আছে সেইখানে কাজ সুরু করি। জলাশয়টি আরও বড় করে তার পাড় ভালভাবে বাঁধিয়ে ফেলা হয়। তারপর পাথরের প্রাসাদের সম্মুখের বড় দরবার হল এবং পুষ্করিণীটির সংস্কার করি। অন্তঃপুরের কক্ষগুলির সম্মুখের বাগান এবং সেই কক্ষগুলিও সুসংস্কৃত করা হয়। এইভাবে কাজ করতে করতে হিন্দুস্থানী রীতি অনুযায়ী যে সব প্রাসাদ ও উদ্যান অপরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাবিহীন ছিল, সেগুলো যথা সাধ্য নিয়ম মাফিক কায়দায় সজ্জিত করা হলো। কোণায় কোণায় উদ্যান রচনা করলাম। প্রতিটি বাগানে গোলাপ ও নার্সিসাস গাছ রোপণ করা হলো। কেয়ারি করে মুখোমুখি এই গাছগুলো রোপণ করা হলো।

হিন্দুস্থানে তিনটি জিনিষ আমার বিরক্তি উৎপাদন করছে—এক গরম, দুই ঝোড়ো হাওয়া, তিন ধুলো। গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া এমন প্রবল হয় যে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কারও ক্ষমতায় কুলোয় না।

স্নানাগারে যেখানে স্নানের জল রাখার টব অথবা চৌবাচ্চা থাকে, সেগুলো পাথরের তৈরী। জলাধার শ্বেতপাথরের এবং এই কক্ষের আর সব যেমন মেঝে ও ছাদ লালপাথরের তৈরী। আমার অন্যসব অনুচর যারা নদীর ধারে জমি সংগ্রহ করেছিল, তারা সেখানে উদ্যান রচনা এবং পুষ্করিণী খনন করে। তারা চরখি তৈরী করে নদী থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। হিন্দুস্থানের লোক যারা এই রকম ভাবে সাজানো কোনও জায়গা পূর্ব্বে কখনও দেখেনি এবং কি পদ্ধতিতে জায়গাগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা যায় তার কোনও ধারণা নাই—তারা যমুনা তীরের এই দিকটায় নতুন তৈরী প্রসাদ ও বাগান দেখে বিস্মিত হয়ে এই জায়গায় নামকরণ করে—'কাবুল'।

আগ্রা দুর্গের ভিতরে প্রসাদ ও দুর্গ প্রকারের মাঝে একটা খালি জায়গা ছিল। আমি এই জায়গায় কুড়ি ফুট চতুষ্কোণ একটা কূপ খনন করার নির্দ্দেশ দিই। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই রকম বড় কূপ যাতে নামার সিঁড়ি আছে তাকে ওয়েন বলে। এখানে উদ্যান-রচনা করার আগেই এই কূপ খনন করা আরম্ভ হয়। বর্ষাকালে যখন মজুররা এই কূপ খননের কাজে ব্যস্ত তখন কয়েকবার মাটির ধ্বস নেমে তারা মাটির নীচে চাপা পড়ে। রাণা সঙ্গর সঙ্গে আমার ধর্ম্ম-যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি এই কূপ খননের কাজ শেষ করতে আদেশ দিই—ফলে একটি মনোরম ওয়েন তৈরী হয়ে যায়। এই ওয়েনের মধ্যে তিনতলা একটি বাড়ী তৈরী করা হয়। নীচ তলাতে তিনটি খোলা কক্ষ। কূপের মধ্য দিয়ে এখানে যাওয়া যায়। সারি সারি সিঁড়ি বেয়ে নামবার পর তিনটি পৃথক পৃথক কক্ষে প্রবেশ করার পথ দেখা যাবে। একটি কক্ষ অপরটির চেয়ে তিন সিঁড়ি পরিমাণ উচু। সব শেষের কক্ষ থেকে আর কয়েকটি সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। যে ঋতুতে কুয়োর জল কমে আসে তখন সেই সিঁড়ি দিয়ে আরও নীচে কুয়োর জলে নামা যায়। বর্ষাকালে যখন জল ওপরে ওঠে, নীচ তলার সব চেয়ে উচু ঘরটার ওপর পর্য্যন্ত জল আসে। দোতলায় বাঁকা পাথরের তৈরী একটি কক্ষ এবং নিকটেই আর একটি গম্বুজওয়ালা ঘর যেখানে বলদরা চাকা ঘুরিয়ে জল তোলে। ওয়েনের ওপরের প্রান্ত থেকে অর্থাৎ কুয়োর ওপর থেকে পাঁচ ছয়টি সিঁড়ির নীচে দিয়ে এই কক্ষের প্রত্যেক দিকে যাওয়ার জন্য আর এক

প্রস্থ করে সিঁড়ি গিয়েছে। এই কক্ষের প্রবেশ পথের বিপরীত দিকের দেওয়ালে এই বাড়ী নির্ম্মাণের তারিখ একটা পাথরে খোদাই করা আছে দেখা যায়। এই কূপের পাশেই আর একটা গর্ত্ত এমনভাবে খনন করা হয়েছে যে তার তলদেশ কূপের মাঝামাঝি গভীরতার চেয়ে কিছু উঁচু। পূর্ব্বে উল্লিখিত গম্বুজ ঘরে বলদগুলো জল তোলার জন্য যে চাকা ঘোরাচ্ছে, সেই জল পাশের গর্ত্তটায় পড়ছে। এই শেষোক্ত গর্ত্ত থেকে আর একটি চাকার সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের সমান উঁচু জায়গায় জল তুলে উঁচু বাগানগুলিতে সেই জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে জায়গায় কূপের সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে, সেই খানটায় একটা পাথরের ঘর তৈরী করা হয়েছে। কূপের চারি দিকের বেষ্টনীর বাইরে পাথর দিয়ে একটি মসজিদও নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুব খারাপভাবে হিন্দুস্থানের রীতি অনুসারে তৈরী।

১৫২৬ সালের ঘটানবলী

মহরম মাসে বেগ উইস্ ফারুকের জন্মের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। যদিও আগেই একজন পত্রবাহক পদব্রজে এই সংবাদ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তবুও বেগ উইস্ এই মাসে সেই সুসংবাদ তার নিজমুখে আমাকে শোনানোর জন্য হাজির হলো। সাওয়াল মাসের ২৩শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় তার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় ফারুক।

বিয়ানা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গোলাবর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ওস্তাদ আলি কুলিকে একটি বড় কামান নির্ম্মাণ করতে নির্দেশ দিই। কারণ, এই দেশগুলো তখনও আমার বশ্যতা স্বীকার করেনি। কতকগুলো হাফর ও আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে নিয়ে সে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জানান যে কামান তৈরীর সব সরঞ্জাম ঠিক করা হয়েছে। ওস্তাদ আলি কি ভাবে কামান ঢালাই করে আমরা দেখতে গেলাম। যে জায়গায় কামান ঢালাই করা হবে তার চারিদিকে আটটি হাফর ও আরও সাজসরঞ্জাম রক্ষিত আছে। প্রত্যেক হাফরের নীচে এক একটি নালী—যে নালীটা কামান ঢালাই এর ছাঁচ পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমার পৌঁছানোর পরই তারা বিভিন্ন হাফরের গর্ত্ত খুলে ফেলে। উত্তপ্ত তরল ধাতু সেই সব নালীর মধ্য দিয়ে ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এইভাবে চলবার পর নানা হাফরের মধ্য দিয়ে সেই তরল ধাতুর প্রবাহে কামানের ছাঁচ সম্পূর্ণ পূর্ণ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেল।

হাফর অথবা গলিত ধাতুর সম্বন্ধে বোধহয় কোনও রকম অসতর্কতা ঘটেছিল। ওস্তাদ আলি কুলি খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়লো। এমন কি সে ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতুর ভিতর ঝাপিয়ে পড়তেও উদ্যত হলো। তার লজ্জা দূর করার জন্য তাকে আমরা উৎসাহিত করতে লাগলাম এবং তাকে একটা সম্মানসূচক পোষাক দিলাম। দুই দিন পর সেই ছাঁচ ঠাণ্ডা হলে ছাঁচের আবরণ খুলে ফেলা হয়। ওস্তাদ আলি খুবই আনন্দিত হয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয় যে কামানের যে কক্ষে গোলা পোরা হয় তাতে কোনও দোষ নাই এবং বারুদের কক্ষটা ও ঠিক ভাবে তৈরী করে ফেলা হয়েছে। গোলার কক্ষটি উঁচু করে তুলে সেটাকে ঠিক করে নিতে সে কয়েক জনকে কাজে লাগায় এবং নিজে বারুদ কক্ষটির কাজ শেষ করার ভার নেয়।

হুমায়ুনের কাছ থেকে ফতে খাঁর ভার নিয়ে মেহিদ খাজা তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসে। ফতে খাঁকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাই। তার পিতার রাজ্য এবং তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে তাকে অর্পণ করি যার মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা। হিন্দুস্থানে যে সব আমির খুব বেশী অনুগ্রহভাজন,— তাদের নানা উপাধি দেওয়ার রীতি আছে। এই রকম উপাধির একটি হচ্ছে— 'আজিম'। হুমায়ুন ছাড়া এই উপাধি আর কারও লাভ করা সঙ্গত নয় মনে করে আমি এই নামের উপাধি বাতিল করে দিই।

সফর মাসের ২০শে তারিখ বুধবার তেঁতুল গাছের পাশে পুষ্করিণীর তীরে চাঁদোয়া খাটানো হয়। সেখানে একটি ভোজের আয়োজন করে ফতে খাঁকে নিমন্ত্রণ করি। তাকে সুরাপান করিয়ে একটি পাগড়ি এবং মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সম্মান সূচক একটি সম্পূর্ণ পোষাক উপহার দিই। তাকে অনুগ্রহ দেখিয়ে এবং সম্মানে ভূষিত করে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দিই। ঠিক হয় যে তার পুত্র মামুদ খাঁ আমার দরবারে থাকবে।

এই বছরের রবিউল আওয়াল মাসের ১৬ই তারিখ শুক্রবার একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি এই। সেই হতভাগ্য মহিলা—ইব্রাহিমের মা শুনতে পেয়েছিল যে আমি হিন্দুস্থানের পাচকদের তৈরী খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকি। তিন চার মাস আগে যখন হিন্দুস্থানের খাদ্য রন্ধন ও তা আহার করার ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না, তখন আমার ইচ্ছা হলো যে ইব্রাহিমের বাবুর্চিদের এখানে ডেকে আনা হোক। পঞ্চাশ কি ষাট জন বাবুর্চির মধ্যে চার জনকে নির্বাচন করে

কাজে নিযুক্ত করা হলো। ঐ মহিলা এই কথা জানতে পেরে একজন লোককে পাঠিয়ে খাদ্য পরীক্ষক আমেদকে ডেকে আনে। একজন ক্রীতদাসীর হাতে কাগজে মোড়া এক আউন্স পরিমাণ বিষের গুঁড়া ঐ খাদ্য পরীক্ষকের হাতে দিতে বলে। আমেদ সেই বিষ আমার একজন বাবুর্চির হাতে দেয়। সে তখন বাবুচিখানার কাজ করছিল। তাকে এই প্রলোভন দেওয়া হয় যে কাজ হাসিল করতে পারলে তাকে চারটি জেলা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। সে যেন এই বিষের গুঁড়া যে কোনও উপায়ে আমার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়। ইব্রাহিমের মা আর একটি ক্রীতদাসীকে সেই প্রথমা ক্রীতদাসীর পিছু পিছু পাঠায়—যার হাতে আমাকে দেওয়ার জন্য বিষ পাঠানো হয়—এইটি দেখবার জন্য যে সেই বিষ সত্যই আমেদের হাতে পৌঁছে কিনা। ভাগ্য ভাল যে সেই বিষ রান্নার পাত্রে ফেলা হয় না—ফেলা হয় থালার ওপর। রসুইয়ের পাত্রে বিষ না ফেলার কারণ এই যে আমার খাদ্য পরীক্ষকদের ওপর এমন নির্দেশ দেওয়া ছিল যে হিন্দুস্থানী পাচকদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যখন রান্না হবে সেই রান্নার পাত্র থেকেই খাদ্য পরীক্ষা করতে হবে। যখন রান্না করা মাংস প্লেটে ঢালা হয় তখন আমার নির্বোধ অন্য খাদ্য পরীক্ষকরা অন্যমনস্ক ছিল। আমেদ সেই সুযোগে বিষের গুঁড়োর অর্দ্ধেকটা একটা প্লেটে কয়েকটা পাতলা রুটির ওপর ছড়িয়ে তার ওপর মাখন-ভাজা মাংস রাখে। যদি বিষের গুঁড়ো ভাজা মাংসের উপর অথবা রান্নাব পাত্রে ছড়িয়ে দিত তাহলে আরও গুরুতর অবস্থা দাঁড়াতো। কিন্তু মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলার জন্য অর্দ্ধেকের বেশী বিষই উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

শুক্রবার অপরাহ্নের নামাজের পর ওরা আমার খানা সাজায়। আমি খরগোসের মাংস খেতে খুব ভালবাসি। এই মাংস কিছু খাই তার সঙ্গে অনেকটা গাজর-ভাজা। আমি তখনও বিস্বাদজনক কিছু বুঝিতে পারিনি। আমি দুই এক টুকরো শুক্‌নো ঝলসানো মাংস খাই। সেইটি খাবার পর আমি বমি বমি ভাব অনুভব করি। আগের দিনেও এই রকম পোড়া মাংসের একটা অংশ খেয়ে আমার কেমন বিস্বাদ লেগেছিল। ঐ রকমই আমার মনে হচ্ছে বমি বমি ভাবটার ব্যাখ্যা এ ভাবেই করেছিলাম। আবার আমার বমির ভাব হতে থাকে। খাবার প্লেট সম্মুখে থাকতেই আমার পেট এমন গুলিয়ে যায় যে দুই তিন বার প্রায় বমি করে ফেলবো বলে মনে হয়। শেষে কিছুতেই বমির ভাব দমন করিতে না পেরে বাইরে যাই। বাইরে আসবার পথেই আমার বুক

ধর ফড় করে ওঠে এবং যেতে যেতেই মনে হলো বমি করে ফেলবো। বাইরে আসার পরই অনেকটা বমি হয়ে গেল।

আগে কখনও খাদ্য গ্রহণ করার পর বমি করিনি। এমন কি মদ খাওয়ার পরও এমন কখনও হয়না। আমার মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমি পাচকদের আটক করে রাখবার জন্য আদেশ দিই। একটা কুকুরকে ঐ খাবার খাইয়ে তাকে বন্ধ করে রাখার জন্য হুকুম করি। পরদিন সকাল বেলা প্রথম প্রহরের পর কুকুরটা পীড়িত হয়ে পড়ে। তার পেটটা ফুলে ওঠে এবং খুব অসুস্থ হয়ে পাড়ছে বলে বোধ হয়। তার দিকে ঢিল ছুঁড়লে এবং নানা ভাবে উত্যক্ত করলেও তাকে শোয়া অবস্থা থেকে দাঁড় করানো গেল না। দুপুর পর্য্যন্ত কুকুরটা এই অবস্থায় ছিল তার পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো। দুইজন যুবকও এই খাদ্যের কিছু কিছু খেয়েছিল। পরদিন সকালে তারাও খুব বমি করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন খুবই অসুস্থ পড়ে। যাহোক তারা দুইজনেই শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়।

বিপদের ঝঞ্ঝা আমার উপর
দিয়ে বয়ে গেল।
নিরাপত্তা ফিরে পেলাম শেষে,
প্রাণ রক্ষা হলো।
মহান আল্লা করিলেন
নবজীবন দান।
পর পার হতে ফিরে এলাম,
পেলাম নব প্রাণ।
যেন মাতৃগর্ভ হতে আবার
আমার জন্ম হলো।'

* * *

'আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম।
আমি মরে গিয়েছিলাম।
তবুও আবার ফিরে পেলাম জীবন।
মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তরণ—
এই নতুন করে পাওয়া প্রাণ
সবই ঈশ্বরের দান, ভুলিনি কখন।

মহম্মদ বকসিকে পাচকদের নজরবন্দী করে রেখে তাদের জেরা করতে আদেশ দিই। অবশেষে, তারা সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ করে যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

সোমবার দরবার দিনে আমি সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান লোক, বেগ এবং উজিরদের দরবার কক্ষে আসবার জন্য নির্দেশ দিই। দুইজন পাচক এবং দুইজন স্ত্রীলোককে দরবার কক্ষে আনিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারা ব্যাপারটির খুঁটি নাটি বিষয় সবই প্রকাশ করে বলে। খাদ্য পরীক্ষককে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিই। পাচকদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। একজন স্ত্রীলোককে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করে পিষে মেরে ফেলার এবং আর একজনকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। ইব্রাহিমের মাকে বন্দীশালায় রাখার জন্য আদেশ জারি করি। সে নিশ্চয়ই তার গুরুতর অপরাধের জন্য আল্লার দরবারে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

শনিবারে আমি শুধু দুধপান করি। সুরায় কিছু 'মাখতুম' ফুল মিলিয়ে ঘেঁটে নিয়ে সেটাও পান করি। আল্লার অসীম দয়ায় আমার পীড়ার আর কোনও চিহ্ন রইলো না! আমি আগে কখনও ধারণা করতে পারিনি যে জীবন এমন মধুময় বস্তু।—কবি বলেছেন—

'মৃত্যুর দুয়ারে আসে যেই জন,
জীবনের মূল্য বোঝে সে তখন।'

এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই মনে হয় যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো। আল্লার করুণা আমাকে নবজীবন দান করেছে। কেমন করে আমার রসনা এই কৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবে? আমার বিতৃষ্ণার ভাব দূর করে ফেলবো মনস্থ করে যা যা ঘটেছিল তার প্রত্যেকটি ঘটনা লিখে রেখেছি। যদিও ঘটনাগুলি বীভৎস এবং মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার উপযুক্ত নয় তবুও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহে সুখের দিনগুলি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি সুখ ও সমুজ্জল স্বাস্থ্য নিয়ে দিন অতিবাহিত করছি।

[বাবর এই সময় দিল্লীর রাজা হয়ে বসেছিলেন—তাঁকে কোনও ক্রমেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বলা চলে না। পানিপথের যুদ্ধে তিনি আফগানদের শক্তি চূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁকে রাজপুতদের প্রধান হিন্দুরাজা রাণা সঙ্গর সাথে এখন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। হিন্দুস্থানের যোদ্ধা জাতির মধ্যে

রাজপুতরা সব চেয়ে যুদ্ধকুশলী। বাবরের সমস্ত অভিযান এ পর্য্যন্ত তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে। এখনই সর্ব্ব প্রথম তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যাচ্ছেন। এর নামই জেহাদ—অর্থাৎ ধর্ম্মীয় যুদ্ধ। রাজপুত জাতি বীর, অধ্যবসায়শীল। যুদ্ধে ও রক্তপাতে নির্ভীক। জাতীয়তা বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা তাদের শিবিরের বীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য সব সময়েই প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের অসমসাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তার কথা ও তাদের সৈন্য সংখ্যার বিপুলতার কথা শুনে বাবরের সৈন্যরা বেশ কিছু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।]

যে কামান ওস্তাদ আলি কুলি তৈরী করেছিল, ঢালাই করবার সময় যার গোলা-কক্ষ অক্ষত আছে জানা গিয়েছিল এবং যার বারুদ-কক্ষ পরে ঠিকমত ঢালাই করে কাজের উপযুক্ত করা হয়েছিল—যার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—সেই কামান দিয়ে কিভাবে ওস্তাদ আলি গোলা বর্ষণ করে তা দেখবার জন্য রবিবারে সেখানে যাই। কামান থেকে কতদূর গোলা নিক্ষিপ্ত হতে পারে সেইটা দেখার উদ্দেশ্য ছিল। অপরাহ্নের নমাজের কাছাকাছি সময় কামানটি দাগা হয়। দেখা গেল—এর গোলা একহাজার দু'শ পদক্ষেপ পরিমিত জায়গা দূরে গিয়ে পড়েছে।

প্রথম জেমাদি মাসের ৯ই তারিখে বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করার জন্য যাত্রা সুরু করি। সহরের উপকণ্ঠ পেরিয়ে সমতল ক্ষেত্রে তাঁবু ফেলে তিন চার দিন সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের যথারীতি উপদেশ দিতে অপেক্ষা করি। হিন্দুস্থানের লোকেদের উপর আমার বিশেষ আস্থা না থাকায় আমি তাদের এলোমেলো ভাবে নানাদিক ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্য আমিরদের নিযুক্ত করি।

এই জায়গাতেই সংবাদ আসে যে রাণা সঙ্গ তার প্রায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে বিয়ানার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমার যে সৈন্যদল আগে পাঠিয়েছি তারা দুর্গে পৌছাতে পারেনি এমন কি দুর্গের লোকেদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করতে ও পারেনি। বিয়ানার দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ দুর্গ থেকে অনেক দূর অসতর্ক ভাবে এগিয়ে যায়। শত্রুপক্ষ অকস্মাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সম্পূভাবে পরাস্ত করে।

আমার মনে হলো, এখন যে রকম অবস্থা তাতে কাছাকাছি জায়গার মধ্যে শিবির স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান হবে সিক্রি—সেখানে পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া

যাবে। কিন্তু এও হতে পারে যে বিধর্ম্মীরা সেখানে জলের উৎসগুলি অধিকার করে সেখানেই শিবির ফেলবে। সেইজন্য আমি সৈন্যদের বুদ্ধ সাজে সাজিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকজন বেগকে অগ্রগামী সৈন্যদলের পালা ক্রমে ভার নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং শত্রুপক্ষের কার্য্যকলাপের সন্ধান নিতে নির্দ্দেশ দিই। যেদিন এই কাজের ভার আবদুল আজিজের ওপর পরে, সে কোনও রকম সাবধানতা অবিলম্বন না করেই সিক্রির দশমাইলের মধ্যে এগিয়ে যায়। বিধর্ম্মী সৈন্যদল যখন এগিয়ে আসছিল তখন তাদের আব্দুল অজিজের বুদ্ধিহীন বিশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে আসার ব্যাপারটা নজরে পড়লো। যখন তারা জানতে পারে তখন তাদের পক্ষের চার পাঁচ হাজার সৈন্য ধেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল আজিজের সঙ্গে এক হাজার কি দেড় হাজার সৈন্য ছিল। শত্রুসৈন্যের অবস্থান ও তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিবেচনা না করেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ঠিক প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি সৈন্য বন্দী হয়ে যায় এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। আমার কাছে অনবরত দূত আসতে থাকে এই সংবাদ নিয়ে যে শত্রু আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তখনই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ঘোড়াদের যুদ্ধসজ্জা পরাণো হলো। তারপরই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। গোলন্দাজদের কামান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম। দুই মাইল অগ্রসর হওয়ার পরই দেখা গেল শত্রুসৈন্য পিছিয়ে পড়েছে।

বাঁ দিকে একটা বড় পুষ্করিণী দেখতে পেয়ে জলের সুবিধার জন্য সেখানেই শিবির স্থাপন করি। কামানগুলো সম্মুখ দিকে রেখে সেগুলো একটার সাথে একটা শিকল দিয়ে বাঁধা হয়। প্রতি দুইটি কামানের মধ্যে ষোলো ফুট জায়গা ফাঁক রাখা হয়। মুস্তাফা রুমি রুমি-রীতি অনুসারে কামানগুলো সাজিয়ে ফেলে। কামান পরিচালনা ব্যাপারে সে অত্যন্ত দক্ষ, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ। ওস্তাদ আলি কুলি তার প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হওয়ায় আমি তাকে হুমায়ুনের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে থাকতে বলি। যে সব জায়গায় কামান ছিলনা সেখানে হিন্দুস্থানি পথ পরিষ্কার ও কোদাল চালক সৈন্যদের গড়খাই খননের কাজে নিযুক্ত করি।

বিধর্ম্মী সৈন্যদের সাহসিকতা, আকস্মিক অগ্রগতি, বিয়ানাতে তাদের কৃতকার্য্যতা এবং শা'মনসুর ও আর যারা বিয়ানা থেকে এসেছিল তাদের মুখ থেকে শোনা শত্রুপক্ষের অসীম সাহসের উচ্চ প্রসংসা—এই সব মিলিয়ে আমার

সৈন্যদের ভীতির সঞ্চারের কারণ হয়। আব্দুল আজিজের পরাজয়ে সেই ভীতি চরমে ওঠে। আমার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে এবং বাহ্যতঃ আমার অবস্থান ঘাটি সুদৃঢ় করতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত কতকগুলি তেপায়ার মত জিনিস তৈরী করা হয়। এক একটি তেপায়া যোল ফুট দূর দূর বসিয়ে ষাঁড়ের চামড়ায় পাকানো দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করতে নির্দ্দেশ দিই। যন্ত্রপাতি ও আসবাব তৈয়ারী করতে কুড়ি পঁচিশ দিন কেটে গেল।

এই সময়ে কাবুল থেকে পাঁচশ' লোক এখানে পৌঁছে গেল। মহম্মদ সেরিয়া নামে একজন সয়তান-স্বভাবের জ্যোতিষী তাদের সঙ্গে আসে। বাবা দোস্ত সুচি যাকে সুরা আনার জন্য কাবুলে পাঠানো হয় সে গজনির কয়েক রকমের উৎকৃষ্ট সুরা তিন সারি উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ দলের সঙ্গেই এখানে আসে। যখন অতীতের ঘটনা এবং অসময়োচিত আজগুবি সংবাদ ছড়ানোর জন্য আমরা সৈন্যরা ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে সেই সময় দুষ্টবুদ্ধি মহম্মদ সেরিয়া কোথায় আমাকে সাহায্য করবে তা না করে সে যাকেই শিবিরে পাচ্ছে তাকেই বলে বেড়াচ্ছে যে এই সময়টা পশ্চিম দিকে মঙ্গল গ্রহ বর্ত্তমান, সে জন্য যে কেউ তার বিপরীত দিক থেকে যুদ্ধ চালাবে তারা পরাস্ত হবে। যারা এই সয়তান জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করলো তারাই আরও হতাশ হয়ে পড়লো। তার এই মূর্খের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে কর্ণপাত না করে আমি এইরকম অবস্থায় যে সমস্ত সাবধনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাই করতে অগ্রসর হলাম এবং আমার সৈন্যগণ যাতে মনোবল ফিরে পেয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারে তেমন অবস্থা সৃষ্টির উদ্যমে লেগে গেলাম।

জেমাদি-উল আওয়াল মাসের ২৩ শে তারিখ সোমবার অশ্বারোহণ করে সৈন্যদলের অবস্থান ঘাটি পরিদর্শনের জন্য বেড়িয়ে পড়ি। ঘোড়ার পিঠে থাকার সময় আমার মনে এইরূপ আত্মসমালোচনা গভীর ভাবে চলতে থাকে যে—আমি বারংবার যেবিষয়ে চিন্তা করেছি অর্থাৎ কোনওনিষিদ্ধ কাজ করলে সক্রিয় ভাবে অনুতপ্ত হবো এইরূপ মনোভাবের কিছু মাত্র অস্তিত্ব এখনও আমার মনের মধ্যে রয়েছে কিনা। আমি নিজের মনেই বলতে লাগলাম :—

'হে মোর আত্মা!
পাপের আনন্দে রহিবে মগন
আর কত দিন?

কর অনুতাপ, অনুতাপ কভু
নহে স্বাদহীন।
বল, পাপে কতদূর কলুষিত হয়েছে
তোমার মন ?
নিরাশায় ডুবে পাপের আনন্দে
মজেছ যখন !
বল, কতটা জীবন এই ভাবে তুমি
নিঃশেষ করেছ ?
কতদিন, বল কতদিন, ইন্দ্রিয়ের
দাস হয়ে আছ ?

* * * *

'ধর্ম্মযুদ্ধ যুঝিবার তরে হয়েছ বাহির।
দেখেছ মৃত্যুর দৃশ্য—যে পথ তোমার মুক্তির।
আত্মাকে রক্ষার হেতু প্রাণ ডালি দেয় যেই জন,
একথা তো তুমি জানো, সেই লভে অনন্ত জীবন।
নিষিদ্ধ ভোগেচ্ছা থেকে দূরে যাক,
পাপ হতে নিজের জীবন মুক্ত রাখ।
এইভাবে চিন্তা করে মনে মনে করিলাম পণ,
লোভ থেকে দূরে সরে' সুরাপান করিব বর্জ্জন।'

সোনা ও রূপার পান পাত্র, পেয়ালা, আরও যে সব পাত্রে সুরাপান বৈঠকে সুরা পরিবেশন করা হয় সেগুলি আনিয়ে ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদেশ দিই। আমার নিজের মনকে পবিত্র করার জন্য সুরাপানের অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করি। সোনা ও রূপার পান পাত্রের টুকরা গুলি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্দ্দেশ দান করি। আমার অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তে প্রথম যে ব্যক্তি যোগ দেয় তার নাম আসাস্। সে আমার মতই প্রতিজ্ঞা করে যে দাড়ি কাটবে না, দাড়ি রাখবে। সেই রাত্রে এবং পরদিন অনেক আমির সভাসদ, সৈন্য এবং এমনও আরও কয়েকজন যারা চাকুরি করেনা সংখ্যায় প্রায় তিনশ জন তারা নিজেদের সংস্কারের শপথ গ্রহণ করে। যে সুরা আমাদের কাছে ছিল তা মাটিতে ঢেলে ফেলা হয়। আমি হুকুম দিই—যে সুরা বাবা দোস্ত

নিয়ে আসছে তাতে নূন ছড়িয়ে ভিনিগার তৈরী করা হোক। যেখানে মদ ঢেলে ফেলা হয় সেখানে একটা পাথরে বাঁধাই ইঁদারা খনন এবং তার কাছেই দানসত্র তৈরী করা হয়। আগেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যদি আমি বিধর্ম্মী রাণা সঙ্গকে' পরাজিত করতে পারি তা হলে দলিলের ওপর যে কর ধার্য্য আছে মুসলমানদের সে কর রেহাই দেব। যখন আমি প্রায়শ্চিত্তের শপথ গ্রহণ করি সেই সময় মহম্মদ সারবান এই কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বলি—তুমি আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠিক করেছ। আমার সমগ্র রাজ্যে দলিলের ওপর ধার্য্য কর তুলে দিলাম। মুসলমানরাই এই কর থেকে রেহাই পাবে। আমার কার্য্যাধ্যক্ষদের ডেকে উপরোক্ত ঘটনা দুইটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমার ফর্ম্মান সমগ্র সাম্রাজের মধ্যে বিলি করতে আদেশ দিই।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি কোনও কোনও কারণে আমার অধীনস্থ ছোট বড় সব শ্রেণীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন একটা লোকও ছিলনা যে সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারে অথবা বলিষ্ঠ ভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। উজিররা—যাদের কাজ হচ্ছে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং আমিররা যাদের কাজ হচ্ছে রাজ্যের ধন সম্পত্তি ভোগ করে আমাকে যথা সময়ে সাহায্য করা—তারা কেউই বীরের মত কথা বলছিল না এবং তাদের পরামর্শে ও হাবভাবে মোটেই সাহসিকতার চিহ্ন ছিল না। আমার এই অভিযানের সমস্ত সময়েই একমাত্র খলিফাই প্রশংসনীয় আচরণের পরিচয় দিয়েছিল এবং সমস্ত ব্যাপারেই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিল। আমার সৈন্যদের সর্ব্বময় হতাশার ভাব এবং মনোবলের অভাব দেখে আমি অবশেষে একটা মতলব ঠিক করি। সমস্ত আমির ও কর্ম্মচারীদের সমবেত করে তাদের সম্বোধন করে বলি 'অভিজাত ভদ্রব্যক্তি ও সৈন্যগণ! প্রত্যেক মানুষকেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে মরতে হবে। আমরা সবাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরজীবী। জীবনের মহোৎসবে যে কেউ আসুক না কেন এই উৎসব সমাপ্তির পর তাকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এই নশ্বর সরাইখানায় যেই এসে পৌছক না কেন তাকে এই দুঃখের আবাস পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তাহলে অগৌরবের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করাই কি কাম্য নয়?

'খ্যাতি নিয়ে যদি মারা যাই
সেই হবে আনন্দ অপার।
খ্যাতিটা আমারই থাক,
মৃত্যু নিক শরীর আমার।

মহান আল্লা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এমন অবস্থায় তিনি আমাদের ফেলেছেন যে যদি রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করি তা হলে আমরা শহিদের সম্মান লাভ করবো। যদি আমরা বেঁচে যাই তাহলে আল্লার কাজ সুসম্পন্ন করায় জয়ের গৌরবে উচ্চশির হবো। সেইজন্য এসো আমরা প্রত্যেক পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করি যে আমরা কেউ এই যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা চিন্তা করবো না। যতক্ষণ প্রাণ আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে না যায় ততক্ষণ এই যুদ্ধক্ষেত্র এবং নরমেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।

প্রভু, ভৃত্য, ছোট, বড় সকলেই আগ্রহভরে পবিত্র কোরাণ হাতে তুলে নিয়ে আমি যে ভাবে বল্লাম সেই ভাবে শপথ করলো। আমার মতলব আশ্চর্য সুন্দর ভাবে সফল হ'লো। সেই সাফল্য দূরে, নিকটে, বন্ধু বা শত্রু সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল।

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার কামানগুলি টেনে নিয়ে এবং সৈন্যব্যূহের দক্ষিণ, বাম এবং কেন্দ্র যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যে ভূমি আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম সেইখানে সৈন্যগণ পৌঁছে গেল। অনেক তাঁবু আগেই খাটানো হয়েছিল। আরও তাঁবু খাটানোর জন্য আমার সৈন্যরা যখন তোড়জোড় করছিল তখন সংবাদ এলো যে শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আদেশ দিই যে প্রত্যেক সৈন্য কালবিলম্ব না করে নিজ নিজ জায়গায় উপস্থিত হোক এবং কামানগুলি ও সৈন্যশ্রেণী সঠিকভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করুক।

আমার যুদ্ধজয়ের ফতেনামা যা সেখ জইন্ লিপিবদ্ধ করেছে যাতে ইসলামের সৈন্যরা কি ভাবে বিধর্ম্মীদের অগণিত সৈন্যের সম্মিলিত যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—সেইটিই কোনওরূপ পরিবর্ত্তন না করে আমার আত্ম-চরিতে সংযুক্ত করে দিলাম।

সেখ জইনের ফতে নামা

মুখবন্ধ—হে মহান আল্লা, তুমি বিশ্বাসীদের রক্ষক, তোমার অনুচরদের সহায়ক, ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের সমর্থক, বিধর্ম্মী শত্রুদের ধ্বংসকারক।

হে মহান আল্লা, ইসলামধর্ম্মের স্তম্ভ যারা, তুমি তাদের মর্য্যাদাদান-কারী, যারা বিশ্বাসী তাদের তুমি সাহায্যকারী, পৌত্তলিকদের তুমি ধ্বংসকারী। বিদ্রোহী শত্রুদের তুমি পর্য্যুদস্তকারী, যারা অন্ধকারের জীব তাদের তুমি নিধনকারী।

হে জগতের প্রভু, পৃথিবীর সমস্ত ভূমি তোমারই। তোমার আশীর্ব্বাদ তোমার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব মহম্মদের উপর বর্ষিত হোক যিনি গাজিদের প্রভু এবং বিশ্বাসীদের সমর্থক—আর তোমার করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পথাবলম্বনকারীদের ওপর শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত, যাঁরা ঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

আল্লার কাছ থেকে উপর্য্যুপরি পাওয়া দানগুলির জন্য তাঁর স্তুতি করার এবং বারংবার তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর কারণস্বরূপ হয়। এরই ফলে আবার লাভ করা যায় তাঁরই করুণা। কারণ, ভগবানের একটি করুণার দানের জন্য তাঁর জয়গান তাঁর প্রাপ্য এবং তারপরই আবার তাঁর করুণা ফিরে আসে। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমানের পরিপূর্ণ-ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত। প্রবলপরাক্রান্ত মানুষও ভগবানের প্রতি বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালন করার বিষয়ে অসহায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে তাঁর দয়ার জন্য যথাযথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব, যদিও তার চেয়ে আর কোনও জিনিষই বড় নয় এই পৃথিবীতে। পরাক্রান্ত বিধর্ম্মীদের পরাজিত করা এবং অতুল ধনসম্পদশালী, নীতিহীন অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করে নেওয়ার ব্যাপারটির মত জাগতিক আর কোনও ব্যাপারই পবিত্রতর নয়। বিচার-শীল ব্যক্তির চোখে ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা আর কিছুই বড় নয়। আল্লা মহান! তাঁর এই মহৎ আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। এই আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য শিশুকাল থেকে এ পর্য্যন্ত ঠিক পথে চালিত একটি মন (বাবর) সক্রিয় ছিল। জগতের রাজা যিনি, যিনি তাঁর করুণা, প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই বর্ষণ করেন, তিনি তাঁর করুণার বাক্সের চাবিকাঠিটি জয়ী নবাবের (বাবর) হাতে তুলে দিয়েছেন —যাতে বিজয়ী বীরপুরুষদের নাম মহান গাজিদের নামের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। বিজয়ী সৈন্যদের সাহায্যে ইসলামের ধর্ম্মনিশান সর্ব্বোচ্চ শিখরে গাঁথা হয়ে গেল। এই সৌভাগ্যের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

রাণা সঙ্গ এবং তাঁর সহচরগণ

ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষক আমাদের সেনারা জয়ের আলোকে হিন্দুস্থান আলোকিত করেছে—যার বাণী পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিপিতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দৈব-অনুগ্রহে ইসলামের পতাকা দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, খারিদ, বেহার ইত্যাদি প্রদেশে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলির বিধর্ম্মী ও মুসলিম অনেক সর্দ্দারই আমাদের সৈন্যদের প্রধান্য স্বীকার করে আমাদের সৌভাগ্যবান নবাবের বশ্যতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু বিধর্ম্মী রাণা সঙ্গ যদিও প্রথমে আনুগত্যের ভাব দেখিয়েছিল কিন্তু পরে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বিধর্ম্মীদের প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। সয়তানের মত মাথা পেছনে হেলিয়ে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মী এক বিপুল সৈন্যদল গঠন করলো। এইভাবে এক দঙ্গল ছোটলোকের ভিড় একত্রিত হলো—যাদের কারও গলায় সোনার হার, কারো গলায় সুতো (উপবীত), কারো কোমরে বিরক্তিকর বিধর্ম্মীর চিহ্ন।

সাম্রাজ্যের সূর্য্য হিন্দুস্থানে উদয় হওয়ার এবং সাহানসার খিলা-ফতের (বাবর) আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মীর (সঙ্গ) কর্ত্তৃত্ব—যে তার শেষ বিচারের দিনে একজন বন্ধুও পাবেনা—এমন ছিল যে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর—যেমন দিল্লীর সুলতান, গুজরাট ও মাণ্ডুর সুলতানরা কেউই অন্যান্য বিধর্ম্মীদের সাহায্য ভিন্ন এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। প্রত্যেকেই এবং সকলেই তাকে তোষামোদ করেছে এবং তার মতে সায় দিয়ে এসেছে। তবে উঁচুদরের রাজারা এবং রহিস্‌রা ও শাসক ও সেনাপতিরা যারা এই যুদ্ধে এখন তার আদেশ মেনে নিয়েছে এবং তার সঙ্গী হয়েছে তারা কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং এর প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। বিধর্ম্মীদের নিশাণ ইসলামের অধিকার ভুক্ত রাজ্যের দুইশ' সহরে উড়েছে—যেখানে মসজিদ এবং পবিত্র স্থান কলুষিত হয়েছে ও যেখান থেকে বিশ্বাসী মুসলমানদের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের গণনানুসারে এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে একশ' অশ্বা-রোহী, এক কোটি রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং রাণা সঙ্গর অধীনস্থ দশকোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে এক লক্ষ অশ্বা-রোহী সৈন্য থাকা উচিত। অনেক প্রসিদ্ধ বিধর্ম্মী যারা এতদিন পর্য্যন্ত তার কোনও সাহায্য করেনি--তারা শুধু ইসলামধর্ম্মবিদ্বেষী বলেই সঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কলঙ্কিত পতাকাধারী দশ জনের যাদের

ভাগ্যে আছে নির্ম্মম শাস্তি ভোগ—তাদের ছিল অনেক জনবল, প্রভূত সৈন্য এবং বিস্তৃত রাজ্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় সালাবুদ্দিন (খুব সম্ভব ইনি ছিলেন হিন্দু রাজপুত থেকে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান—যাঁরা হিন্দু নাম ছিল—সিলহাদি, যাঁর কথা বাবর লিখেছেন। তাঁর পুত্র রাণা সঙ্গর কন্যাকে বিবাহ করে। তাঁর জায়গির ছিল রেসিন ও সারংপুর। তিনি খানুয়ার যুদ্ধে দলত্যাগ করে বাবরের সঙ্গে যোগ দেন।)—যাঁর রাজ্যে ছিল ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, বাজরের রাওয়াল উদয় সিংএর ছিল বারো হাজার, মিওয়াতের হাসান খাঁর ছিল বারো হাজার, ইদরের বারমলের ছিল চার হাজার, নর-পৎ হারার ছিল সাত হাজার, কাচের সাতরইয়ের ছয় হাজার, ধরম দেওয়ের ছিল চার হাজার, বীর সিং দেওয়ের ছিল চার হাজার এবং সিকেন্দারের পুত্র মহম্মদ খাঁয়ের—যদিও কোনও জিলা বা পরগণা ছিল না তবুও সে, দশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করেছিল আধিপত্য লাভের আশায়।

হিন্দুস্থানের গণনার রীতি অনুযায়ী সর্ব্বসমেত দুইলক্ষ এক হাজার সৈন্য সমবেত হয়ে তাদের নিজেদেরই পরিত্রাণের আশা ছিন্ন করেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেই উদ্ধত বিধর্ম্মী—যে কুসংস্কারে অন্ধ ও অন্তরে দয়ামায়া শূন্য—অন্যান্য দুর্ভাগা ও নরকের যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলাম—অনুগামীদের এবং আল্লার সৃষ্ট মানবের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যার শিরে আল্লার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে এমন যে মহম্মদ তাঁর অনুশাসনের ভিত্তি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজকীয় সৈন্যদের নায়কগণ ভগবানের অভিসম্পাত রূপে সেই এক চক্ষু দজ্জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের এই কথার সত্যতা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল যে যখন দুর্ভাগ্য আসে তখন চোখে অন্ধ হয় এবং এই সত্য তাদের চোখের ওপর ভাসতে লাগলো যে—কেউ যদি সত্য ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তার নিজের আত্মরই উন্নতি সাধন করে। ধর্ম্মের নীতির প্রতি অনুগত্য দেখিয়ে তারা অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে জেহাদ সুরু করলো।

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার (২৭সে মার্চ, ১৫২৭) যে তারিখটি আল্লার আশীর্ব্বাদে পূত হয়ে আছে। ইসলামের সৈন্যগণ বিয়ানা রাজ্যের অধীনস্থ খানুয়ার একটি পাহাড়ের ধারে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে শত্রুসৈন্য দুই ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিল। মহম্মদের ধর্ম্মের শত্রু অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা ইসলামীয় সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পেয়ে তাদের হতভাগ্য সৈন্যদের সজ্জিত করে পর্বত সদৃশ দৈত্যের মত আকৃতির হস্তীদের ওপর অশেষ আস্থা স্থাপন করে

এগিয়ে আসতে লাগলো যেমন করে হস্তী যূথের অধিনায়ক ইসলামের পবিত্র ভূমি কাবাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল।

[এই কথা গুলির ইঙ্গিত এই।—এ্যাবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান ইউমেনের রাজা আব্‌রাহা মহম্মদের জন্মসনে তাঁর সৈন্য ও হস্তীযূথ নিয়ে মক্কার কাবা ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়। মক্কাবাসীরা এই বিপুল সৈন্য বাহিনী দেখে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে পলায়ন করে কারণ তাদের নগর এবং ধর্ম্মস্থান রক্ষা করার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু ভগবান এই দুইটিরই রক্ষার ভার নেন। কারণ, আবরাহা যখন মক্কার নিকট উপস্থিত হয়ে এই নগরীতে প্রবেশ করার অয়োজন করছেন সেই সময় যে বৃহদাকার হস্তীতে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন—যার নাম ছিল মামুদ—সে সহরের আরও নিকটে যেতে অস্বীকার করলো। যখনই তাকে সহরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল—তখনই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছিল। কিন্তু তাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই চলতে সুরু করছিল। যখন এই ব্যপার চলছে তখন দেখা গেল এক বিশাল ঝাক পাখী সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে এলো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনটি পাথর—একটি তাদের চঞ্চুতে, আর দুইটি তাদের প্রত্যেক পায়ে। এই পাথর গুলো তারা আবরাহার প্রত্যেকটি লোকের মাথায় ফেললো এবং সেই পাথরের আঘাতে প্রত্যেকটি লোকই মারা গেল যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও বন্যার প্লাবনে ও মহামারিতে ধ্বংস হলো। শুধু একাকী আবরাহা সেনায়াতে পৌছাতে পারে এবং সেখানেই মারা যায়।]

'সেই মৃত্যু সন্ধ্যায়, হস্তী বলে বলীয়ান
আবরাহের ছিল যে ভরসা,
গজ বাহিনীর পরে' কলঙ্কিত হিন্দুগণ
একই ভাবে করেছিল আশা।
অমানিশার চেয়েও অন্ধকার,
ঘৃণ্য, কলুষিত,
নক্ষত্রের চেয়েও সংখ্যায় অধিক,
অগণিত।
আগুনের শিখার মত ? না—না—
ধোঁয়ার মত

মেঘ মুক্ত আকাশের নীচে তারা
হলো উপনীত।
তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো,
তারা দ্বন্দে আহ্বান জানালো।
পিপীলিকা শ্রেণীর মত
দক্ষিণ ও বামদিক থেকে
হাজার হাজার অশ্বারোহী
ও পদাতিক নির্গত হলো।'

তারা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আমদের সৈন্য শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। ইসলামের পবিত্র যোদ্ধাগণ, যারা শৌর্য্যের উদ্যানে সতেজ বৃক্ষ—শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো, যেন সারিবদ্ধ পাইন গাছ তাদের মাথা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে এগিয়ে আসছে। আল্লার কাজে যে সব সেবক নিযুক্ত তাদের অন্তরে যেমন সদাই উজ্জলপ্রভা বিদ্যমান, তেমনি তাদের উচ্চশিরে পরিহিত শিরস্ত্রাণের ঔজ্জল্য। এই সৈনিক শ্রেণী যেন আলেকজেন্ডারের লোহার দেওয়াল। মুসলিম ধর্ম প্রবর্ত্তকের আইনানুযয়ী তারা ঋজু, দৃঢ় এবং বলবান-যেন তারা সুগঠিত একটি অট্টালিকা। 'যারা ভগবানের নির্দেশে কাজ করে তারা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করে'—এই নীতিবাক্য অনুযায়ী তারা সৌভাগ্য শালী এবং কৃতকার্য্য হয়েছিল।

সৈন্যব্যূহ মধ্যে কেউ ছিল না ভীরু,
সাহানশার পণের মত তারা ছিল শক্ত,
ইসলাম ধর্ম্মের তারা সবাই ছিল ভক্ত।
ভয়ে কারও বুক করেনি দুরু দুরু।
তাদের পতাকা যেন আকাশ
ছুঁয়ে গেল।
তাদের জয়ে আল্লার নিশ্চিত,
জয় হলো।'

খুব সাবধানে এবং বিজ্ঞোচিত ভাবে রুমের নিয়মানুযায়ী গোলন্দাজ ব্যহিনীকে কামানের গাড়ীগুলির কাছে দাঁড় করানো হলো। আমাদের সম্মুখভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ কামানের গাড়ীগুলি। বস্তুতঃ ইসলামের সৈন্য এমনভাবে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো যে তাদের দৃঢ় চিত্ততা ও বুদ্ধির দীপ্তি দেখে যেন সমগ্র আকাশ

তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সৈন্য সজ্জার আয়োজন ও সংগঠনে নিজামউদ্দিন কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং সৌভাগ্যের দ্যোতক তার উত্তম সম্রাটের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল বিচারে যথারীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সৈন্যব্যূহের কেন্দ্রস্থলের সেনাপতিগণ

কেন্দ্রস্থলে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে ছিলেন—বিখ্যাত, নিষ্ঠাবান ভ্রাতা (সম্বন্ধে ইনি বাবরের মামাতো ভাই), সৌভাগ্যের প্রিয় সহচর, যাঁর কৃপা সব সময়েই প্রার্থনা করা হয় সেই আল্লার সুদৃষ্টি যাঁর উপর নিবদ্ধ, অনুগৃহীত চিন তাইমুর সুলতান ; মহান আল্লার সম্রাটের পুত্রস্থানীয় (এঁর পিতা তাইমুর বংশের এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই। এঁদের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আবু সৈয়দ মির্জ্জা। এঁর বয়স ছিল তেরো বছর এবং সা'বেগমের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদাকসানের সা') প্রসিদ্ধ সুলেমান সা ; পবিত্রতার ধারক, সৎপথপ্রদর্শক খাজা কামালুদ্দিন দোস্ত-ই-খন্দ ; সুলতানদের বিশ্বাসী, ঘনিষ্ঠ সহচর, সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামানুদ্দিন ইউনুস-ই আলি ; রাজকর্মচারিদের স্তম্ভ, অপকট সুহৃদ, ধর্ম্মবিশ্বাসে মহিমান্বিত জালালুদ্দিন দরবেশ-ই মহম্মদ সারবান্ ; রাজকর্মচারিদের আর এক স্তম্ভ, অমাত্য-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান—নিজামুদ্দিন দরবেশ-ই-সারবান ; রাজকর্মচারিদের আর দুইটি স্তম্ভ—বিশ্বাসী গ্রন্থাগারিক সাহাবুদ্দিন আবদাল্লা ও দ্বার পালদের কর্ত্তা নিজামুদ্দিন দোস্ত।

কেন্দ্রের বাম দিকে ও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছিলেন—সাম্রাজ্যে শক্তির উৎস সম্রাটের মিত্র ও বিশেষ অনুগ্রহভাজন সুলতান বাহালুল লোদির পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন আলম খাঁ ; মহান সম্রাটের অন্তরঙ্গ, মৌলভি-শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য জাতির সাহায্যকারী ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভ খাওয়াসের সেখ জইন্ (সেখ নিজেই নিজের গুণ ব্যাখ্যা করছেন যেন তিনি নিজকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখাচ্ছেন। তাঁর গুণাবলীর সায় দিয়ে গিয়েছেন) ; অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামালুদ্দিন মহবুব আলি, রাজ-অনুচরদিগের আর এক বিরাটপুরুষ পরলোকগত কুজ আমেদের ভ্রাতা নিজামুদ্দিন তারদি বেগ ; উপরোক্ত মৃত কুজের পুত্র সের আফগান ; মহান ব্যক্তিদের মধ্যেও মহান পরাক্রমশালী আরাইস খাঁ ; মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিন লুসেনি এবং সম্রাট দরবারের আরও কয়েকজন পার্শ্বচর।

দক্ষিণ বাহুর সেনানায়কগণ

দক্ষিণ বাহুতে আছেন—মাননীয়, ভাগ্যবান, যার দেহে আছে ভাবী সাম্রটত্বের চিহ্ন, খিলাফতের গগনে যিনি সফলতার সূর্য্য, যিনি ক্রীতদাস ও স্বাধীন সবারই প্রশংসিত সম্রাটপুত্র মহম্মদ হুমায়ুন বাহাদুর। এই মহান সম্রাটপুত্রের ডান দিকে আছেন কাসেম-ই-হুসেনি সুলতান যিনি আভিজাত্যে রাজার মত এবং যিনি অনুগ্রহ-বিতরণকারী সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আর আছেন অভিজাতকুলের স্তম্ভস্বরূপ আমের-ই-ইউসুফ অঘটাকচি; সম্রাটের বিশ্বাসভাজন অমাত্যকুলতিলক জালালুদ্দিন হিন্দ বেগ কাচিন; সম্রাটের বিশ্বাসী ও আনুগত্যে ত্রুটিহীন জালালুদ্দিন খসরু কুকুলদাস; সম্রাটের আস্থাভাজন—কোয়ায়ুম বেগ অর্দুসা; রাজকীয় কর্মচারীদের স্তম্ভ, আন্তরিকতায় কলুষহীন, কোষাধ্যক্ষ ওয়ালি কারা কাজি; অমাত্যদের মধ্যে আর এক স্তম্ভ সিস্তানের নিজামুদ্দিন পিরকুলি; সভাসদগণের স্তম্ভ বাদাকসানের খাজা কামালুদ্দিন পালওয়ান, রাজকীয় ভৃত্যদের শীর্ষস্থানীয় আব্দুল সরকার; আভিজাতদের স্তম্ভ, অমাত্যদের মধ্যে বিশেষ গুণী, ইরাক দেশ থেকে আগত দূত সুলেমান আকা এবং সিস্তানের দূত হুসেন আকা।

জয়ের মুকুট যাঁর শিরে সেই অশেষ সৌভাগ্যবান সম্রাট পুত্রের বামদিকে আছেন মহানকুলোদ্ভব সৈয়দ মুর্ত্তজা আলির বংশধর মির হামা; অমাত্য-কুলের স্তম্ভ আন্তরিকতায়পূর্ণ সামসউদ্দিন মহম্মদ কুকুল দাস এবং নিজামুদ্দিন খোবাদগি আসাদ জানদার।

দক্ষিণ দিকে আছেন—হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, খাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাঁ—দিলওয়ার খাঁ (দৌলত খাঁর পুত্র) এবং অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ, সেখেদের মধ্যে সেখ—সেখ গুরান। এঁরা দুইজন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

বামবাহুর সেনায়কগণ

ইসলামের সৈন্যবাহিনীর বাম বাহুতে মর্য্যাদাসম্পন্ন অনেকে ছিলেন। যেমন মহান বংশের প্রতিভূ, শক্তিমানদের আশ্রয় তা' হা' এবং ইয়াসিনের বংশের গৌরব, শ্রেষ্ঠ দেবদূতের (মহম্মদের) বংশধারার আদর্শ সৈয়দ মার্যি খাজা, মহিমময়, ভাগ্যবান, সম্রাটের বিশেষসম্মানভাজন ভ্রাতা মহম্মদসুলতান মির্জ্জা; রাজ-পরিবারের তুল্য মর্য্যাদা-সম্পন্ন মেহেদি সুলতানের পুত্র আদিল সুলতান; সম্রাটের অতিবিশ্বাসী ও আস্থাভাজন অশ্বশালার অধ্যক্ষ আবদুল আজিজ;

বন্ধুত্বে অকপট, সম্রাটের আস্থাভাজন সামসউদ্দিন মহম্মদআলি জং জং; রাজ অমাত্যদের স্তম্ভ, আন্তরিকতায় ত্রুটিহীন, জালালুদ্দিন সা হুসেন ইয়ারগি মোগল এবং নিজামুদ্দিন জান্-ই মহম্মদ বেগ আটাকা।

হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে এই বিভাগে ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয়—কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ; অমাত্যশ্রেষ্ঠ ফর্মালের আলি খাঁ সেখ জাদ এবং অভিজাতদের স্তম্ভ বিয়ানার নিজাম খাঁ।

পার্শ্বরক্ষী সৈন্যদল

পার্শ্বরক্ষী দলের দক্ষিণ ভাগ চালনার জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অতি-বিশ্বাসী তার-দিক্ এবং বাবা কাস্‌কার ভাই মালিক কাসিম অবস্থান করছিলেন একদল মোগল সৈন্য নিয়ে। এই দলের বাম ভাগ চালনার জন্য একদল নিপুণ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্বস্ত সর্দার মুমিন আটাকা ও রুস্তম তুর্কমান।

রাজকীয় অনুচরদের অবলম্বন, আনুগত্যে ত্রুটিহীন, সভাসদগণের মধ্যমণি নিজামুদ্দিন সুলতান মহম্মদ বকসি ইসলামের গাজি সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করতে গেলেন। তিনি নানা দিকে সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী ও দূত প্রেরণ করলেন—মহান সুলতান ও আমিরদের নিকট কি ভাবেসম্রাটের আদেশানুযায়ী সৈন্য পরিচালনা করতে হবে। আদেশ ছিল যে সেনানায়কগণ তাদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে স্থান গ্রহণ করলে তাঁরা অন্য কোনও আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না এবং আদেশ না পেলে যুদ্ধ করবার জন্য বাহু বিস্তার করবেন না।

যুদ্ধ

উপরোক্ত দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদল পরস্পর অভিমুখে এগিয়ে আসতেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যে ভাবে আলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে দুই দলের কেন্দ্রভাগ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। দক্ষিণ ও বাম বাহুর সৈন্যদের মধ্যে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল যে সেই যুদ্ধের দাপটে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো এবং আকাশ তুমুল ঝন্ ঝন্ শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল।

হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদলের বামবাহু ধর্ম্ম বিশ্বাসে বলীয়ান সৈন্যদের দক্ষিণ বাহুর দিকে অগ্রসর হয়ে খসরু কুকুলদাস ও বাবা কাস্‌কার ভাই মালিক

কাসিমের সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। অশেষ মহিমান্বিত, অতি ন্যায়বান ভ্রাতা চিন্ তাইমুর সুলতান আদেশানুসারে তাদের দলবৃদ্ধি করতে এগিয়ে গেলেন এবং সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে বিধর্ম্মী সৈন্যদের পশ্চাৎ-ভাগে হাটিয়ে দিলেন। এই কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হলো।

এ যুগের বিস্ময় গোলন্দাজবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় মুস্তাফা তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছিলেন। সেই খানে ছিলেন সম্রাটের গৌরবদীপ্ত পুত্র হুমায়ুন বাহাদুর—যিনি ন্যায়বান এবং সৌভাগ্যশালী, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন, কিছু করা না করার ব্যপারে যাঁর আদেশ অমোঘ—সেই পরাক্রান্ত সম্রাটের যিনি বিশেষ প্রীতিভাজন।

মুস্তাফা কামান-শকট গুলি সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বিধর্ম্মী সৈন্য শ্রেণী ছত্র ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কামানের গোলা বর্ষন সুরু করলেন।

যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে মহান্ ভ্রাতা কাসিম-ই-হুসেন সুলতান ও রাজ-অনুচরদের স্তম্ভদ্বয় নিজামুদ্দিন আমেদই-ই-ইউসুফ ও কুয়ায়াম বেগ আদেশানু সারে তাদের সাহায্যের জন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হলেন। যেমন দলের পর দল বিধর্ম্মী সৈন্য তাদের দলকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি ভাবে আমারাও আমাদের পক্ষ থেকে সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, ধর্ম্মের গৌরবে-গৌরবান্বিত হিন্দুবেগ এবং তাঁর পশ্চাতে অভিজাতদের স্তম্ভ মহম্মদ কুকুলদাস ও খাজাগি আসাদ জানদার এবং তাঁদের পশ্চাতে দরবারের আস্থাভাজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরশীল, গোপনীয় কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের প্রধান ইউনুস-ই-আলি ও অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ, বন্ধুত্বে যিনি খাঁটি, সা মনুসুর বুরলাস এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয়, বিশ্বস্ততায় পবিত্র গ্রন্থাগারিক আবদুল্লা এবং তাঁদের পরে অভিজাতদের অবলম্বন দ্বাররক্ষীদের কর্ত্তা দোস্ত এবং খোজাকারীকদের সর্দার খলিলকে পাঠানো হলো।

বিধর্ম্মী সৈন্যদের দক্ষিণবাহু ইসলাম সৈন্যদলের বাম বাহুর উপর বারং বার উন্মত্তের মত আক্রমন করতে লাগলো। মুক্তি যাদের করতলগত সেই ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের ওপর তারা ভীষণভাবে আপতিত হলো কিন্তু প্রত্যেকবারেই জয়ী যোদ্ধাদের শরবিদ্ধ হয়ে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। তারা ক্রমশঃ চিরমৃত্যুর আবাস নরকে যাওয়ার পথে নামতে লাগলো—যেখানে তাদের আগুনে দগ্ধ হওয়ার জন্য নিক্ষিপ্ত হতে হবে

এবং সেই নরকেই হবে তাদের নিরানন্দ নিবাস। কৃষ্ণকায় বিধর্মীদের সৈন্য ব্যূহের পাশ্চাৎভাগে অভিজাতদের মধ্যে বিশ্বাসভাজন মুমিন আতাকা ও রুস্তম তুর্কমান উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সম্রাটের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সিংহাসনের নিকটতম সেই আস্থাভাজন সুলতান নিজামুদ্দিন আলি খলিফার কর্মচারী খাজা মামুদ ও আলি আতাকাকে পাঠনো হলো।

মহান ভ্রাতা মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা, রাজমহিমার প্রতিভূ আদিল সুলতান এবং সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, মাধুর্য্যে মধুর, মহম্মদ আলি জং জং এবং রাজঅনুচরদের স্তম্ভ সা হোসেন ইয়ারগি মোগল যুদ্ধ করার জন্য নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিনকে একদল সৈন্যসহ পাঠানো হলো।

প্রত্যেকটি ধর্মযোদ্ধার উৎসাহের সীমা ছিলনা। তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো এই নীতি বাক্য সপ্রমাণ করতে যে—প্রার্থনীয় জিনিষের মধ্যে একটি লাভ হবে—হয় জয় নয় ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু। যদি মৃত্যু হয় তাহলে এ জীবনে ধর্মে অনুরাগ প্রদর্শনের এই তো সুযোগ যাতে ধর্ম্মেরই নিশান তুলে ধরা হবে মৃত্যুকে বরণ করে।

সঙ্ঘর্ষ ও যুদ্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হচ্ছে দেখতে পেয়ে অলঙ্ঘনীয় আদেশ জারী করা হলো যে—রাজকীয় সৈন্যদল যারা সবাই তুল্য বীর্য্যবান এবং যারা শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কামানবাহী শকটের পশ্চাতে অবস্থান করছে—তারা এগিয়ে এসে গোলান্দাজবাহিনীকে মধ্যবর্ত্তী স্থলে রেখে কেন্দ্রের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ সুরু করুক। যেমন পূর্ব্ব আকাশ ভেদ করে ঊষার উদয় হয় তেমনি ভাবে শকটগুলির পশ্চাৎভাগ থেকে তাদের আবির্ভাব হলো। ঊষার রক্তিম অলোকছটা যেমন আকাশের তল থেকে ছিটকিয়ে এসে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে সেই হতভাগ্য বিধর্মীদের রক্তবর্ণ রুধির ধারা রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লো। এ যুগের বিস্ময় ওস্তাদ আলি কুলি তাঁর কামান নিয়ে কেন্দ্রস্থলের সম্মুখ ভাগ অবস্থান করছিলেন। সম্মুখস্থ লৌহ নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় হস্তিবাহিনী এবং বর্ম্মপরিহিত বিধর্মীদের ওপর তিনি বৃহদাকার প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করে অসীম বীরত্বের কাজ করেছিলেন। তুলাদণ্ডে যদি গোলাগুলি ওজন করা যায় তা সেই ওজনের চেয়ে তাঁর পুণ্য কর্মের ওজন বেশী হবে। এই গোলাগুলি যদি তলার দিকে প্রশস্ত এবং উচ্চশীর্ষ পাহাড়ের গায়ে নিক্ষেপ

করা হতো তা হলে সেই পাহাড়টা পেঁজাতুলোর মত হয়ে যেতো। মজবুত দুর্গের মত লৌহবর্ম্মপরিহিত বিধর্ম্মীদের ওপর ওস্তাদ আলি কুলি এমন ভাবে প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করছিলেন এবং কামান ও বন্দুক থেকে গোলা ও গুলি এমন ভাবে ছোঁড়া হচ্ছিল সে বিধর্ম্মীদের বর্ম্মপরিহিত অনেক দেহ ধ্বংস হয়ে গেল। কেন্দ্রস্থলের বন্দুকধারী সৈন্যগণ আদেশানুসারে শকটগুলির পেছন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকেই বিধর্ম্মীদের মৃত্যু-বিষের স্বাদ বুঝিয়ে দিল। সম্মুখের সেনাদল সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা অরণ্যের ব্যাঘ্রের মত সাহসী এবং তাদের নাম যারা বীরত্বের কাজে অগ্রণী, তাদের নামের সঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে।

ঠিক এই সময় মহিমান্বিত সম্রাটের আদেশ হলো—কেন্দ্রস্থলে কামানবাহী শকটগুলি অগ্রসর হোক। সম্রাট স্বয়ং—যাঁর ডান হাতের মুঠোয় জয় ও সৌভাগ্য এবং বাম হাতে যশ ও অধিকার--বিধর্ম্মী সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন। বিজয়ী সৈন্যগণ চার দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করলো। দেখে মনে হলো -যেন চলন্ত সৈন্যসমুদ্র এবং সেই সমুদ্রে প্রবল ঢেউ উঠছে। এই সমুদ্রের কুমিরগুলির শৌর্য্য ও বীরত্বও তাদের দৃঢ়তায় প্রকাশ পেলো। আকাশ ধুলিকণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রণক্ষেত্রে যে ধুলিমেঘের সৃষ্টি হলো তার মধ্যে তরবারির ঝলকানি দেখে মনে হতে লাগলো যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেমন আয়নার পেছন দিক দিয়ে মুখ দেখা যায় না তেমনি ধূলিজালের মধ্য দিয়েও সূর্য্যের মুখও দেখা যাচ্ছিল না। আঘাতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত, জয়ী এবং পরাজিত এক সঙ্গে মিশে গেল এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যও আর ধরা গেল না। সময়ের যাদুকর এমন একটি রাত্রির আকাশের সৃষ্টি করলো যায় একমাত্র গ্রহ হলো তীর এবং স্থির নক্ষত্রমণ্ডলী হলো দৃঢ় সংবদ্ধ সৈন্যব্যূহ।

'সেই যুদ্ধের দিনে, জগৎ ধাত্রী মৎস্য
রক্ত স্রোতে ভেসে গেল।
প্রশস্ত রণক্ষেত্রে, অশ্ব ক্ষুরাঘাতে,
ধূলি মেঘ সৃষ্টি হলো।
সেই ধূলি মেঘে আকাশের চাঁদ
একেবারে ঢাকা পড়লো।
যেন একটি পৃথিবী আকাশে উঠে,
আর এক স্বর্গ গড়লো।'

(বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে মুসলমান মত-বাদে মৎস্য পৃথিবীর ধারক। এই কবিতায় সেই মৎস্যের উল্লেখ। যুদ্ধের ভীষণতা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে—যেন পৃথিবীর সাতটি ভূখণ্ডের মধ্যে একটি আকাশে উঠে গিয়ে সপ্তম স্বর্গের স্থলে অষ্টম স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এই কবিতাটি ফার্দোসির সাহানামা থেকে গৃহীত)।

যে সময়ে পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকরা অবলীলাক্রমে তাদের জীবন উৎসর্গ করছিল সেই মূহূর্ত্তেই এই গোপন বাণী তাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল—লজ্জা করো না, দুঃখও করো না। বিশ্বাস করো। এই সব অবিশ্বাসীদের অনেক ওপরে তোমাদের মহিমা প্রচারিত হবে। সেই অভ্রান্ত সংবাদবাহীর নিকট তারা এই আনন্দময় বাণী শুনতে পেল—সাহায্য পৌঁচেছে আল্লার কাছ থেকে। দ্রুত যুদ্ধ জয় হবে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে এই শুভ বার্ত্তা পৌছে দাও।' তারপর তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। তাদের কানে পয়গম্বরদের প্রশংসাবাণী প্রবেশ করলো। আল্লার দরবারের ফিরিস্তা (দেবদূত) তাদের মস্তকের চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের মত ঘুরতে লাগলো। প্রথম ও দ্বিতীয় নমাজের দধ্যবর্ত্তী সময়ে এমন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠ্লো যে সেই আগুনের শিখার নিশান যেন আকাশ স্পর্শ করলো। ইসলামের সৈন্যদের দক্ষিণ ও বাম ভাগ হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদের বাম ও দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদের তাড়া করে তাদের কেন্দ্রস্থলের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একাকার করে ফেললো।

ইসলামের যোদ্ধাদের জয়ের এবং ধর্ম্মের নিশান উড্ডীন হওয়ার চিহ্নগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা এবং শয়তান অবিশ্বাসীরা এক ঘণ্টার মত সময় হতবুদ্ধির মত নিশ্চল হয়ে রইলো। তারপর তারা মরিয়া হয়ে আমাদের কেন্দ্রস্থলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাম পার্শ্বের ওপর তাদের আক্রমণের বেগ গুরুতর হলো এবং সেইদিকে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু ধর্ম্মযোদ্ধাগণ যাদের মন সৎকাজের পুরস্কার পাওয়ার দিকে নিস্তব্ধ তাদের তীর বিধর্ম্মীদের প্রত্যেক বক্ষে বিদ্ধ করতে লাগলো। বিধর্ম্মীদের ভাগ্য এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাদের পতন হলো। এইরূপ অবস্থায় সুখী সম্রাটের ভাগ্যক্ষেত্রে 'জয় এবং সৌভাগ্যের মলয় বাতাস বইতে লাগলো এবং তাঁর কাছে এই শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। (সত্যই প্রত্যক্ষ জয়দান করা হয়েছে) সেই সুন্দরী রমণী—জয় যাঁর নাম—যাঁর কুঞ্চিত কেশদাম স্বয়ং ঈশ্বর সজ্জিত করেন তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

যে সৌভাগ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, সে আবরণ খুলে গেল এবং তা বাস্তবে পরিণত হলো।

কুযুক্তিপরায়ণ হিন্দুরা তাদের ধ্বংসজনক অবস্থার কথা উপলব্ধি করে বাতাসের মুখে যেমন পেঁজা তুলো উড়ে যায় এবং পতঙ্গরা ভেসে যায় সেই ভাবে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হলো অনেকে আহত হয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু অবশেষে কাক-শকুনির খাদ্যে পরিণত হলো। মৃত ব্যক্তিদের দেহ দিয়ে স্তূপ এবং মাথা দিয়ে স্তম্ভ রচিত হলো।

মৃতের তালিকার মধ্যে মেওয়াতের হাসান খাঁকে পাওয়া গেল—গোলার মুখে যার মৃত্যু হয়েছে। উপজাতিদের অনেক একগুঁয়ে সর্দার এইভাবে তীরের কিংবা গোলার মুখে শেষনিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে আছে বাজরের (উদয়পুর) রাজা রাওয়াল উদয় সিং, ডুংগারপুরের শাসক—যার অশ্বসংখ্যা বারো হাজার, চার হাজার অশ্বের মালিক রায় চন্দ্রবান চৌহান, চান্দেরির রাজা ভূপত রাও—যার অশ্বসংখ্যা ছয় হাজার, মাণিক চাঁদ চৌহান এবং দিলপৎ রাও যাদের প্রত্যেকের ছিল চার হাজার অশ্ব, গাঙ্গু, করমসিং ও দানকুশি যাদের প্রত্যেকের ছিল তিন হাজার অশ্ব এবং আরও অনেকে যারা ছিল দল ও জাতির নেতা ও দুর্দ্ধর্ষ সর্দার। এরা সকলেই নরকের পথে যাত্রা করলো, মাটির পৃথিবী থেকে নরকের গর্ভে বাস করার জন্য। যেমন নরক পূর্ণ থাকে, সেইরূপ শত্রুরাজ্যের রাস্তাগুলি হত ও আহতদের দেহে পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট মাটির গর্তগুলি দুষ্কৃতিকারীদের দেহে ভরতি—যাদের আত্মা নরকের প্রভুর হাতে সমর্পিত হয়েছে। যেদিকেই ইসলামের সৈন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই কোনও না কোনও মৃতদেহ তাদের চোখে পড়েছে। ইসলামের সুবিখ্যাত সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের পিছন পিছন যে দিকেই ধাওয়া করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যে অগণিত ভূপতিত শত্রু দেহে ভূমি এমন আবৃত যে—পা ফেলার স্থান নাই।

'হস্তীযূথ-প্রভুর সেনাদলের মত
যারা পাথরের ঘায়ে হয়েছিল হত!
এই হীন ঘৃণ্য হিন্দুর দলও
কামানের গোলায় ধরাশায়ী হলো।
তাদের শব দিয়ে হলো পাহাড় গড়া,
পাহাড়ের ঝরণা, তাদের রক্ত ধারা।

আমাদের নিপুণ সেনার তীরের ভয়ে,
মাঠে পহোড়ে অনেকে গেল পালিয়ে।'

তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লার আদেশই পালনীয়। এখন তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন কর—যিনি সবই শুনতে পান। সবখানেই যিনি বিরাজিত। জয় এসেছে একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে যিনি পরম শক্তিমান এবং জ্ঞানী। (জমাদি-উল সানি মাসের ২৫শে তারিখ ৯৩৩ হিজারি সন—২২শে মার্চ, ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত)।

যুদ্ধজয়ের বর্ণনার পর আত্মকথার পুনরারম্ভ

শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার পর আমরা দ্রুত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে একের পর এক তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলা হলো। আমাদের শিবির থেকে রাণা সঙ্গর শিবিরের দূরত্ব প্রায় ক্রোশ দুই হবে। তার শিবিরে পৌঁছিয়ে তাকে অনুসরণ করার জন্য মহম্মদ আবদুল আজিজকে এবং আরও কয়েক জনকে পাঠানো হলো। কিন্তু তাদের কাজে হয়তো শিথিলতা ছিল। (সেই কারণেই রাণা সঙ্গ পালাতে পেরেছিল। এই বছরেই রাণা মারা যায়। সন্দেহ হয় তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়)। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। অন্যের উপর নির্ভর করে এই গুরুভার অর্পণ করা ঠিক হয়নি। এই বিধর্ম্মীর শিবির থেকে ক্রোশ খানেক অগ্রসর হয়ে আমি ফিরে এলাম—কারণ দিনের আলো নিভে এসেছে। আমাদের শিবিরে যখন ফিরে আসি তখন রাতের নমাজের সময়।

এই যুদ্ধ জয়ের পর আমার রাজকীয় পদবীগুলির মধ্যে 'গাজি' এই উপাধিটাও যোগ করি। আমার-এই জয়ের সরকারি বিবরণে রাজকীয় উপাধিগুলি লেখার পর এই কবিতাটিও লিখে রাখি।

(তুর্কিতে) 'নিজ ধর্ম্ম ভাল বেসে মরুভূমিতে ঘুরেছি।
বিধর্ম্মী হিন্দুদের শত্রু বলে ভেবেছি।
শহীদ হইব আমি আশা ছিল তাই।
আল্লার দয়ায় হলাম গাজি, আর খেদ নাই।'

মহম্মদ সেরিফ—সেই জ্যোতিষী যার বিকৃত ও রাজ-দ্রোহকর আচরণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি—সে আমার জয়ের জন্য সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলো। আমি তাকে গালাগালির স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম। এই ভাবে আমার রাগটা যখন পড়ে এলো এবং মনটাও হালকা হলো তখন সে পৌত্তলিকের মত আচরণ

বিশিষ্ট বিকৃত স্বভাব। অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক এবং অকথ্য দুর্মুখ হলেও সে আমার পুরাতন ভৃত্য বিবেচনা করে উপহারস্বরূপ চার হাজার টাকা দিয়ে তাকে বরখাস্ত করি। আদেশ দিই যেন সে আমার রাজ্য অবিলম্বে ত্যাগ করে চলে যায়।

পরদিনও আমাদের শিবিরেই থেকে যাই। মহম্মদ আলি জং জং, সেখ গুরণ ও বর্ম্মরক্ষক আবদুল মালিকের সঙ্গে বিপুল সৈন্যবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহী ইলিয়াস খাঁকে দমন করার জন্য পাঠানো হলো। সে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কোয়েল নিজের অধিকারে এনে কিচিক আলিকে বন্দী করে। আমার সৈন্যদল অগ্রসর হলে তার দলের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন পর তাকেও বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। সেখানে তার জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

আদেশ দেওয়া হলো যে বিধর্ম্মীদের শির দিয়ে একটি জয় স্তম্ভ তৈরী করে যে পাহাড় ও আমাদের শিবিরের মাঝখানে এই যুদ্ধ হয় সেই ছোট পাহাড়ের ওপর সেই স্তম্ভ খাড়া করা হোক।

সেই স্থান ত্যাগ করে দুইরাত্রি মধ্যপথে বিশ্রাম করে আমরা ২০শে মার্চ রবিবার বিয়ানায় পৌছাই। বিধর্ম্মী এবং ধর্ম্মত্যাগীদের অগণিত মৃতদেহ—যারা যুদ্ধে হত হয়েছে—বিয়ানা পর্য্যন্ত,—শুধু বিয়ানা নয়—আলওয়ার ও মেওয়াৎ পর্য্যন্ত ছড়ানো ছিল।

শিবিরে ফিরবার পর আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানের আমিরদের আহ্বান জানাই এই আলোচনা করবার জন্য যে এই সময় রাণা সঙ্গর দেশে অভিযান চালানো উচিত হবে কিনা। কিন্তু পানীয় জলের স্বল্পতা এবং পথে অতিরিক্ত গরম ভোগ করতে হবে এই জন্য প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

মেওয়াৎ প্রদেশ দিল্লী থেকে বেশী দূর নয়। এর রাজস্ব তিন চার কোটি টাকার মত। হাসান খাঁ মেওয়াতি এই দেশের শাসনভার তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিল—যারা এই রাজ্য বংশপরম্পরায় একাদিক্রমে দুই এক শতাব্দী শাসন করেছে। দিল্লী-সুলতানদের অধীন হলেও তাদের বশ্যতা নাম মাত্র ছিল। হিন্দুস্থানের সুলতানরা তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই হোক কিংবা সুবিধার অভাবেই হোক অথবা এই স্থানের পার্ব্বত্য প্রকৃতির জন্যই হোক কখনও মেওয়াৎকে সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেন নি। এই দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন না করতে পেরে তাঁরা যেটুকু বশ্যতা তাদের কাছ থেকে

পেয়েছিলেন—তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও হিন্দুস্থান জয়ের পর সুলতানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাসান খাঁকে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী ব্যক্তির ভালবাসা ছিল বিধর্মীদের প্রতি। অনুগ্রহ এবং প্রসিদ্ধি দান করে আমি তার প্রতি যে সদায় ব্যবহার করেছি তা উপেক্ষা করে সে ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের নেতা হয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিধর্মীদের দেশে সৈন্য চালনা করার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হওয়ায় আমি মেও-য়াৎকে বশীভূত করার জন্য মনস্থ করলাম। চারবার সৈন্য চালনা করে অগ্রসর হওয়ার পর পঞ্চমবার সৈন্য চালনা করে এই প্রদেশের রাজধানী আলোয়ার দুর্গ থেকে ছয় ক্রোশ দূরে মানস্ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি। হাসান খাঁর পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী ছিল তিজারায়। যে বৎসর আমি হিন্দুস্থান আক্রমণ করে পাহাড় খাঁকে পরাস্ত করার পর লাহোর এবং দেবলপুর অধিকার করি (১৫২৪) সেইসময় আমার সৈন্যদের অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয়ে হাসান খাঁ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করে।

করমচাঁদ নামে হাসান খাঁর একজন প্রধান কর্ম্মচারী যে হাসান খাঁর পুত্র যখন আগ্রা দুর্গে বন্দী ছিল তখন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল-সেই হাসান খাঁর পুত্রের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসে। আবদুল রহিম সাখা-ওয়েলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিই। হাসান খাঁর পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে তার কোনও ভয় নাই এবং তার নিরাপত্তার সম্বন্ধেও আশ্বাস দান করি। তারা দুই জনই হাসান খাঁর পুত্র নাহির খাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। তাকে আবার অনুগ্রহ দেখিয়ে ভরণপোষণের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার আদায়ী পরগণা দান করি।

আমি খসরু গোকুলতাসকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত পরগণা এবং আলোয়ারের শাসন ভার প্রদান করি। কারণ আমার ধারণা ছিল যে যুদ্ধে ভালভাবে তার কার্য্য সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সে তার দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজাজ দেখিয়ে আমার এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আমি পরে জানতে পারি—যে কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছিলাম সে কাজ সে করেনি। করেছিল চিন্ তাইমুর সুলতান। সুলতানকে মেওয়াতের রাজধানী তিজারা নগর এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করি। তার্দিকাকে—যে রাণা সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণ-দিকের পার্শ্বে-রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিল এবং যে অন্য সকলের চেয়ে যুদ্ধে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল তাকে

আলোয়ার দুর্গের ভার দিয়ে পনরো লক্ষ টাকার সংস্থান করে দিই। আলোয়ার কোষাগারের ধনসম্পত্তি হুমায়ুনকে প্রদান করি।

রজব মাসের ১লা তারিখ উপরোক্ত শিবির থেকে রওনা হয়ে আলোয়রের দুই ক্রোশের মধ্যে পৌছে যাই। তারপর আলোয়ার দুর্গ দেখতে যাই এবং সে রাত্রি সেখানেই অবস্থান করি। পরের দিন শিবিরে ফিরে আসি।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ছোট ও বড় সকলেই যখন শপথ গ্রহণ করে তখন তাদের বলেছিলাম যে যুদ্ধ জয়ের পর যারা হিন্দুস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছা করবে তাদের ছুটি দেওয়া হবে। হুমায়ুনের সৈন্য-দলের অধিকাংশই বাদাকৃসানের অধিবাসী। তারা কোনও সময়ই এক মাস কি দুই মাসের বেশী সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে কাবুল ছেড়ে থাকেনি। যুদ্ধের পূর্ব্বেও তাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব কারণে এবং তা ছাড়া কাবুল সৈন্যশূন্য আছে দেখে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তাদের সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন কাবুলে ফিরে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত করার পর রজব মাসের ৯ই তারিখ বৃহস্পতিবার আলোয়ার থেকে যাত্রা করে মানস নদীর তীরে পৌছিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

মেহেদি খাজাও অনেক অস্বস্তি ভোগ করছিল। তাকেও কাবুলে যাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। বিয়ানার সামরিক সমাহর্ত্তার পদে ফটক-রক্ষীদের প্রধান পরিচালক দোস্তকে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে এটোয়ার ভার মেহেদি খাজাকে দেওয়ার কথা ছিল। কুতুব খাঁ এইস্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর মেহেদি খাজার পুত্রকে তার পিতার স্থলে এইখানে পাঠানো হয়।

কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য হুমায়ুনকে ছুটি দিয়ে এই জায়গায় দুই তিন দিন অবস্থান করি। বার্ত্তাবাহক মুমিণ আলিকে যুদ্ধ জয়ের বিবরণ সহ (ফতেনামা) কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করার সময় হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থানের বেশীর ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের পরগণা ও জেলাগুলো পুনর্দখল করে নেয়—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলতান মহম্মদ দুলদাই কনৌজ রাজ্য ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছিল। সে আর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হলো না—সেটা তার ভয়ের জন্য হোক অথবা দুর্ণামের জন্যই হোক। কনৌজের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাকে পনরো লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ী শিরহিন্দের ভার দেওয়া হলো এবং

ত্রিশ লক্ষ টাকার কনৌজের শাসনভার মহম্মদ সুলতান মির্জাকে অর্পণ করা হলো। কাসিম-ই-হুসেনকে বাদায়ুন দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের সময় বিবন্ লুকনুর (রামপুর রাজ্যের সাহাবাদের পুরাতন নাম) অবরোধ করে। তার বিরুদ্ধে অভিযান চালনার জন্য কাসিম-ই-হুসেনকে পাঠানো হয়। তার সঙ্গে যায়—মহম্মদ সুলতান মির্জা, তুর্কি-স্থানের আমিরদের মধ্যে বাবা কাসকা মালিক কাসিম তার ভাইদের আর তার অধীনস্থ মোগল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, বল্লম অস্ত্র ক্ষেপণে পারদর্শী আবুল মহম্মদ মুয়াদ তার পিতার এবং হুসেন খাঁ দরিয়াখানের দলবল নিয়ে, মহম্মদ তুলদাইয়ের সৈন্যদল, হিন্দুস্তানের আমিরদের মধ্যে আলি খাঁ ফরমুলা, মালিক দাদ কারনানি, সেখ মহম্মদ এবং তাহার খান খানি জাহান।

এই সৈন্যদল যখন গঙ্গানদী পার হওয়া আরম্ভ করে, সেই কথা জানতে পেরে বিবন্ সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা তার পিছন পিছন খয়রাবাদ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে তারপর ফিরে আসে।

আগেই ধন-সম্পদ বিভাগের কাজ শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিধর্মীদের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় প্রদেশগুলির শাসনের ব্যবস্থা করার সময় পাইনি। পৌত্তিলিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ঝামেলা মেটার পর আমি বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলা-গুলির শাসনভার কার কার ওপর দেওয়া হবে সেটা ঠিক করার সময় পাই। বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসছে দেখে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে রাখতে এবং বর্ষা শেষ হলে আমার সঙ্গে পুনরায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ দিই।

এই সময় আমার কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন দিল্লিতে ফিরে গিয়ে কতকগুলি বাড়ীতে যেখানে সঞ্চিত ধন ছিল সেই বাড়ী খুলে জোর করে অর্থ দখল করেছে। তার এই রকম বিসদৃশ আচরণের কথা কখনও ধারণা করি নাই। এতে আমি মনে বিষম আঘাত পাই। কড়া চিঠি লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

আমি তারদি বেগকে দরবেশের জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলি। এইভাবে সে বহু বৎসর সেবা করেছে। আবার দরবেশ-জীবনে ফিরে যাওয়ার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। সে আমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলো। ছুটি মঞ্জুর করে কোষাগার থেকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে কামরানের কাছে দূত হিসাবে পাঠানো হলো।

গত বৎসর যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে তাদের মনোভাবটা কতকটা প্রকাশ করে আমি একটুকরো কবিতা লিখেছিলাম। সেইটি মোল্লা আলিখাঁর নামে তারদি বেগের মারফৎ তরে কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

'হায়রে!

'হিন্দুস্থান ত্যাগ করি'
তোমরা তো গিয়েছ চলিয়া!
এ দেশের ব্যথার স্মৃতি
এখনও কি যাওনি ভুলিয়া?
সেথাকার মনোরম পরিবেশ
তোমাদের করেছিল আকুল,
ক্ষিপ্রপদে হিন্দুস্থান করি' ত্যাগ
তোমরা তাই গিয়েছ কাবুল।
যেসুখের সন্ধান তরে
সেখানে গিয়েছ।
ঘরোয়া আরাম সুখ শান্তি
নিশ্চয় লভেছ।
এত দুঃখ, এত ব্যথা
হেথায় বদিও সয়েছি,
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
মোরা এখনও বেঁচে আছি।
অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যথা,
শারীরিক কষ্ট দুঃখ
এবে করেছ অতিক্রম।
জেনে রেখো একই ভাবে
আমরাও লভিয়াছি সুখ
এতটুকু নহে ব্যতিক্রম।'

আমার এগারো বছরের বয়স থেকে কখনও একই জায়গায় দুইবার রমজান উৎসব দেখি নাই। গত বৎসর আমি রমজান উৎসবের সময় আগ্রায় ছিলাম। এই প্রথা বজায় রাখার জন্য ১০ই তারিখ রবিবার রাত্রে রমজান উৎসব পালন করার জন্য সিক্রিতে আসি। যুদ্ধ জয়ের স্মারক সূচক উদ্যানের উত্তর পূর্ব্ব কোণে

একটি পাথরের উঁচু মঞ্চ তৈয়ারী করা হয়। তার উপর কয়েকটি বড় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে উৎসব উদ্‌যাপন করি। যে রাত্রে আমরা আগ্রা ত্যাগ করি, সেই রাত্রেই মির আলি চলে যায়। সে তাস খেলতে ভালবাসতো। সে কতকগুলি তাস চেয়ে পাঠায়। আমি তা পাঠিয়ে দিই।

৫ই জেল্‌কদ, শনিবার আমি অসুখে পড়ি। অসুখ সতেরো দিন ধরে চলেছিল।

এই সময়টা নানা লোকে সেখ বেজিদের সম্বন্ধে নানা কথা বল্‌ছিল। সুলতান কুলি তুর্ককে তার কাছে পাঠিয়ে বলা হয় যে কুড়ি দিনের মধ্যে সে যেন আমার সামনে হাজির হয়।

জেলহজ্জ মাসের ২রা তারিখ শুক্রবার থেকে আমি কোরাণের একটি অধ্যায় একচল্লিশ বার পড়তে আরম্ভ করি। আমি এই সময় এই কবিতাটি লিখি।

বলবো কি তার আঁখির কথা ?
অথবা ভুরু তার ?
আগুনের মত গায়ের রং
কিংবা কণ্ঠস্বর ?
তার দেহ সৌষ্ঠবের কথা
না তার গণ্ডদেশ ?
তার চুলের বাহার
না তার কটিদেশ ?

২রা জেলহজ্জ আমি আবার অসুখে পড়ি। অসুখে নয় দিন ভুগলাম।

২০শে জেলহজ্জ আমরা অশ্বারোহণে কুল ও সম্বলের দিকে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

মহরম মাসের ১লা তারিখ শনিবার আমরা কুলে (আলিগড়) এসে পৌঁছাই। হুমায়ুন দরবেশ-ই-আলি এবং ইউসুফ-ই-আলিকে সম্বলে রেখে যায়। তারা একটা নদী পার হয়ে কুতুব সেরওয়ানি এবং চল্লিশজন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং অনেক লোককে হত্যা করে। তারা কয়েকটি নরমুণ্ড ও একটি হাতী আমাদের কাছে কুল-এ পাঠিয়ে দেয়। তখন আমরা সেখানে ছিলাম। কুল-এ দুই দিন কাটানোর পর সেখ গুরাণের আমন্ত্রণে তার বাড়ীতে আসি। সেখানে সে তার আতিথ্যে আমাদের পরিতৃপ্ত করে এবং আমাদের সামনে উপহার দ্রব্য রাখে।

বুধবার দিন আমরা গঙ্গা নদী পার হয়ে সম্বল এলাকায় একটা গ্রামে রাতটা কাটাই। বৃহস্পতিবার আমরা সম্বলে অবতরণ করি। সেখানে দুইদিন থাকবার পর শনিবারে চলে আসি।

রবিবার আমরা সিকেন্দারায় রাও শিরওয়ানির ভবনে পৌছাই। সে আমাদের আহারের আয়োজন করে ও নিজেই খাদ্য পরিবেশন করে। যখন আমরা ভোরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি তখন এমন ভাবটা দেখাই যেন আমি সকলকে পিছনে ফেলে একাই চলে যাব। আমি দ্রুত কদমে আগ্রার এক ক্রোশের মধ্যে একাই এসে পৌছাই। সেখানেই আমার সঙ্গীরা আমাকে ধরে ফেলে। মধ্যাহ্নে সামাজের সময় আমরা আগ্রা পৌছে যাই।

মহরম মাসের ১৬ই তারিখ আমার আবার জ্বর এবং শারীরিক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। পঁচিশ ছাব্বিশ দিন এই জ্বর ঘুরে ঘুরে আসে। আমি ওষুধ খেতে থাকি এবং কিছু আরাম পাই। এই সময়টা পিপাসায় ও অনিদ্রায় খুবই কষ্ট পাই।

আমরা অসুখের সময় দুই একটি চতুষ্পদী কবিতা রচনা করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই :—

'দিনের বেলায় ভুগি প্রবল জ্বরে
নিশীথে যায় আঁখির নিদ্ দূরে।
যন্ত্রণা আর সহিষ্ণুতা পাশাপাশি রহে।
একটা যদি কমতে থাকে আর একটি বাড়ে।

সফর মাসের ২৮শে তারিখ শনিবার আমার দুই পিসিমা ফকর-ই-জাহান বেগম ও খাদিজা-সুলতান-বেগম সিকান্দারায় আসেন। আমি কিছুদূর এগিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।

রবিবার ওস্তাদ আলি কুলি একটি বড় কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করে। গোলাটি অনেকদূর পর্যন্ত যায় বটে, কিন্তু কামানটি চুরমার হয়ে যায়। তার এক এক টুকরার ধাক্কায় কয়েকজন আহত হত হয় এবং আটজন মারা যায়।

প্রথম রবিয়ল মাসের ৭ই তারিখ সোমবার সিক্রি পরিদর্শনের জন্য অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। হ্রদের মাঝখানে একটি আট কোণা মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলাম। দেখলাম সেটা তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে সেখানে একটা নেশার আসর বসানোর ব্যবস্থা করি।

সিক্রি থেকে ফেরার পর প্রথম রবিয়াল মাসের ১৪ই তারিখ সোমবার রাত্রে

চান্দেরির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য রওনা হই। তিন ক্রোশ যাওয়ার পর জলসিরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। সেখানে লোকদের যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করে রবিয়াল মাসের ১৭ই তারিখ (ডিসেম্বর ১২ই) বৃহস্পতিবার পুনরায় সৈন্য চালনা করে আনওয়ারে এসে নামি। আমি নদী পথে নৌকায় আনওয়ার ত্যাগ করি এবং চান্দওয়ার ছাড়িয়ে নৌকা থেকে নামি।

কদম কদম এগিয়ে গিয়ে আমরা ২৮শে তারিখ সোমবার কানওয়ারে প্রবেশ পথের কাছাকাছি অবতরণ করি।

রবিয়স সানি মাসের ২রা তারিখ বৃহস্পতিবার আমি নদী পার হই। নদীর এপারেই হোক আর ওপারেই হোক সমস্ত সৈন্য পার হতে চার পাঁচ দিন দেরী হয়ে যায়। এই কয়েকদিন আমরা নৌকায় ঘুরে বেড়াই এবং মোদক খাই। কানওয়ারে যাওয়ার পথ চম্বল নদীর দুই এক ক্রোশ উজানে। শুক্রবার আমি একটি নৌকায় চড়ে এ রাস্তায় এসে পৌঁছাই এবং শিবিরে উপস্থিত হই। যদিও সেখ বেজিদ শক্রতাচরণ করছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবুও তার অসদাচরণে এবং কার্য্যে একটা অনুমান হচ্ছিল যে তার হয়তো শক্রতা করার মতলব আছে। এই জন্য সৈন্যদলের মধ্য থেকে মহম্মদ আলি জংজংকে নির্ব্বাচিত করে তাকে কনোজ থেকে মহম্মদ সুলতান, মির্জ্জা এবং সেখানকার আমির ও সুলতানদের যেমন—কাসিম-ই-হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান, মালিক কাসিম কুকি, বল্লমধারী আবদুল মহম্মদ ও মিনুচুর খাঁ আর তাদের ছোট বড় ভাইরা এবং দরিয়া খামিসকে আনার জন্য পাঠানো হলো যাতে তারা এক সঙ্গে বিদ্রোহী আফগানের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। উপদেশ দেওয়া হলো যে তারা যেন প্রথমে সেখ বেজিদকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যদি সে দ্বিরুক্তি না করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যেন তাকে সঙ্গে নেওয়া হয়। তা যদি না করে তাহলে যেন তাকে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি কয়েকটি হাতি চাওয়ায় দশটি হাতি তার সঙ্গে দেওয়া হয়। তাকে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়ার পর বাবাচুরাকেও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

১৫২৮ সনের ঘটনাবলী

চান্দেরি যাত্রার বিবরণ

কানার থেকে দুই মাইল নৌকা যোগে যাই। ১লা জানুয়ারি, রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ বুধবার কালপির এক ক্রোশের মধ্যে অবতরণ করি। শিবিরে বাবা

কুলি আমাকে সম্বর্দ্ধনা করতে আসে। সে খলিল সুলতানের পুত্র। খলিল সুলতান সৈয়দ খানের ছোট সহোদর ভাই। গত বৎসর সে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে আন্দারআব সীমান্ত থেকে ফিরে আসে। যখন সে খাস্‌ঘরের কাছাকাছি আসে, সেই সময় সৈয়দ খান হায়দার মহম্মদকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

পরদিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি আমরা আলমখাঁর বাড়ী কুলপিতে আসি। আমাদের জন্য সে হিন্দুস্থানি খাদ্যের আয়োজন করে এবং নানা উপহার দ্রব্য দেয়।

১১ই জানুয়ারি আমরা কান্দিরে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

১২ই জানুয়ারি রবিবার চিন তাইমুর সুলতানকে ছয় সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করে চান্দেরির বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রগামী দল হিসাবে পাঠিয়ে দিই। তার সঙ্গে যায় বেগ বাকি মিংবাসি (এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক), কুজবেগের ভাই তারদি বেগ, খাদ্য-পরীক্ষক আসিক বেগ, মোল্লা আহাক, মুসিম জুলদাই এবং হিন্দুস্থানি বেগদের মধ্যে সেখ গুরণ।

১৭ই জানুয়ারি শুক্রবার (দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৪শে তারিখ) আমরা কাচোয়ার নিকটে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। এখানকার অধিবাসিদের উৎসাহিত করে বদরউদ্দিনের পুত্রকে এই জায়গার শাসন ভার অর্পণ করি।

এই স্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরী করে একটি বড় গোলাকায় হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে যার আয়তন প্রায় দশ বারো বর্গ মাইলের মত। এই হ্রদ কাচোয়াকে তিন দিকে ঘিরে আছে। উত্তর পশ্চিম দিকে খানিকটা জায়গা শুকনো রাখা হয়। সেখানেই কাচোয়ার প্রবেশের ফটক। হ্রদের ওপর অগণিত ছোট ছোট নৌকা—যাতে তিন চার জন লোক ধরে। যদি এখানকার লোককে কোনও কারণে পালাতে হয় তাহলে নৌকায় চড়েই যেতে হয়। কাচোয়ায় পৌছানোর আগেও দুইটি হ্রদ দেখা যায়—সেগুলো কাচোয়ার হ্রদের চেয়ে ছোট এবং এই হ্রদ দুটিও পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে।

কাচোয়ায় আমাদের একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কারণ এইখানে কয়েকজন কর্ম্মক্ষম ওভারসিয়ার ও মাটি কাটার লোকদের রাস্তা সমতল করা ও জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কাচোয়া এবং চান্দেরির মধ্যে

স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। ১৯শে জানুয়ারি আমরা কাচোয়া ত্যাগ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একরাত্রি বিশ্রাম করি তারপর বুরহানপুর অতিক্রম করে চান্দেরি থেকে ছয় মাইল দূরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

চান্দেরি দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তার নীচে সহর এবং বহির্দুর্গ। তারও নীচে সমতল রাস্তা—যার উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল করে। যখন আমরা বুরহানপুর ত্যাগ করি সেই সময় (১০ই জানুয়ারি) গাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্য চন্দেরির দুই মাইল নীচর রাস্তা দিয়ে যাই।

২১শে জানুয়ারি-একটা রাত বিশ্রামের পর আমরা অগ্রসর হয়ে বাজাত খাঁয়ের পুকুরের পারের ওপর দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৮শে তারিখ মঙ্গলবার এসে পৌছাই।

২২শে জানুয়ারি—প্রত্যুষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দেওয়াল-ঘেরা সহরের চারিদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ, বামে, মধ্যস্থলে ঘাটি স্থাপন করি। ওস্তাদ আলি কুলি প্রস্তর গোলা নিক্ষেপের জন্য একটি জায়গা নির্ব্বাচিত করে। মজুর ও ওভারসিয়ারদের সেই নির্ব্বাচিত স্থান উঁচু করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—যার ওপর কামান স্থাপন করা হবে। সমস্ত সৈন্যদলকে দুর্গ অধিকার করার জন্য যন্ত্রপাতি, মই ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আদেশ করা হয়।

পূর্ব্বে চান্দেরি মাণ্ডু সুলতানদের অধীনে ছিল। যখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মারা যান (তিনি ১৫০০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মালওয়ার শাসক ছিলেন) তাঁর এক পুত্র সুলতান মামুদ যিনি এখন মাণ্ডুর শাসক তিনি এর পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর অধিকার স্থাপন করেন, এবং আর এক পুত্র চান্দেরি দখল ক'রে সেকেন্দার লোদির অধীনস্থভাবে সেখানে থাকেন। সেকেন্দার লোদিও মহম্মদ সাহের পক্ষাবলম্বন করে তাঁর সাহায্যের জন্য বিপাল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। মহম্মদ সা সুলতান সেকেন্দারের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। তিনি আমেদ সা নামে এক নাবালক পুত্র রেখে সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্বকালে মারা যান। সুলতান ইব্রাহিম আমেদ সাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর একজন নিজের লোককে চান্দেরির শাসক নিযুক্ত করেন। যে সময় রাণা সঙ্গ সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে এবং ইব্রাহিমের অধীনস্থ বেগরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে—সেই সময় চান্দেরি রাণার হাতে যায় এবং রাণা চান্দেরির শাসন ভার মেদিনী রায়ের ওপর অর্পণ করে। রাণার বিশ্বাসভাজন এই বিধর্ম্মী মেদিনী রায় চার পাঁচ হাজার বিধর্ম্মীর সঙ্গে এইখানে ছিল।

জানা গিয়েছিল যে মেদিনীরায় এবং আরাইস খাঁয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সেইজন্য শেষোক্ত ব্যাক্তিকে সেখ গুরণকে সঙ্গে দিয়ে মেদিনী রায়ের নিকট অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তার নিকট এই প্রস্তাব করা হয় যে, চান্দেরির পরিবর্ত্তে তাকে সামসাবাদের (সংযুক্ত প্রদেশে) শাসন ভার দেওয়া হবে। কিন্তু মেদিনী রায়ের দুই একজন বিশ্বস্ত অনুচর এই আপোষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে—যার ফলে কোনও মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যায় না। হয়তো মেদিনী রায়ও এই আপোষ প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, অথবা তার দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অজেয় এই ভ্রান্তি গর্ব্বে সে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ (২০শে জানুয়ারি) মঙ্গলবার আমরা খাঁয়ের পুষ্করিণীর তীর থেকে চান্দেরি দুর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্য চালনা করি। দুর্গের নিকট একটি পুষ্করিণীর পাশে এসে ভূমিতে অবতরণ করি।

এই দিনই সকালে মাটিতে পা দেওয়ার পরই খলিফা দুই একটি চিঠি নিয়ে আসে। তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে—পূব দিকে যে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তারা অবিবেচকের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে এবং লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে কনোজে গিয়েছে। বুঝলাম এই পরাজয়ের সংবাদে খলিফা অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হয়েছে। তার মনের ভাব বুঝে আমি বল্লাম ভয়ের বা অস্থির হওয়ার মত কোনও কারণ ঘটেনি। আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই সম্পন্ন হয় না এবং যা তিনি আগের থেকে ঠিক করে রেখেছেন তা ঘটবেই। এখন চান্দেরির ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। যে সব কথা আমাদের বলা হলো—সে কথা আর যেন উচ্চারিত না হয়। আগে আমরা দুর্গ আক্রমণ করবো। এই কাজ শেষ হলে দেখা যাবে সামনেতে কি আছে।

চান্দেরি দুর্গ অবরোধের সূচনা

শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে। তারা বহির্দুর্গে এক এক দলে দুই তিন জন লোককে রেখেছে সতর্কতার জন্য। সেই রাত্রে আমাদের পক্ষের লোক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। শত্রুপক্ষের অল্প কয়েকজন লোক যারা বহির্দুর্গে ছিল তারা যুদ্ধ করেনি, তারা দুর্গের ভিতর পালিয়ে যায়।

প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ বুধবার (২১শে জানুয়ারি) আমার সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত হতে আদেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ ঘাটিতে উপস্থিত থেকে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে নামবার প্ররোচনা দিয়ে নিজ নিজ স্থান থেকে আক্রমণ

সুরু করতে বলে আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি।

পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা ফেলে রেখে ওস্তাদ আলিকুলির প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ দেখার আমোদ উপভোগ করতে সেই দিকে চলে আসি। এই গোলা নিক্ষেপে কোন ফল লাভ হলো না, কারণ কামান ঠিক জায়গায় বসানোর স্থান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দুর্গ দেওয়াল আগা গোড়া পাথরে তৈরী থাকায় খুবই মজবুত ছিল।

চন্দেরি দুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই পাহাড়ের একপাশে নীচ দিয়ে দুই দেওয়াল ঘেরা রাস্তা (দুতাহি) গিয়েছে জলাশয় পর্য্যন্ত। আমাদের আক্রমণ চালানোর এই একটি প্রধান স্থান। এই জায়গাটি আমার দক্ষিণ ও বাম দিকের এবং কেন্দ্রের রাজকীয় সৈন্যদের প্রধান ঘাটি বলে স্থির করা হয়েছিল। যদিও প্রত্যেক দিক থেকেই আক্রমণ সুরু হয়েছিল তবুও বেশী ধাক্কা এইখানেই সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের সাহসী সৈন্যরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি. যতই না বিধর্ম্মীরা এদের ওপর প্রস্তর এবং জ্বলন্ত আগুন নিক্ষেপ করুক। অবশেষে সা মহম্মদ ইয়ুস্ক বেগি 'দুতাহি' প্রাচীর —যেখানে বহির্দুর্গের দেওয়াল ছুঁয়েছে-সেই প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়ালো। আমার সাহসী সৈন্যেরাও দলে দলে নানা স্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং এই ভাবে 'দুতাহি' দখল হয়ে গেল। এই সব ঘটনা ঘটে গেলেও বিধর্ম্মীরা কোনও বাধা দিল না। যখন আমাদের দলের লোক দুর্গ প্রাচীরের ওপর ভিড় করলো তারা দ্রুত পালিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে আমাদের অনেক সৈন্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করলো। তারা দুর্গ প্রাচীরের ওপর দিয়েই তাদের তাড়িয়ে এনে কতক লোককে কেটে হত্যা করলো। তারা কেন প্রাচীর থেকে সহসা প্রথমে সরে গিয়েছিল, তার কারণ হয়তো এই যে—পরাজিত হতে হবে এই আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করে তারাও হয়তো তাই করেছিল। তারা দুর্গের ভিতর গিয়ে সমস্ত মহিলা ও সুন্দরীদের হত্যা করে তারপরে নিজেদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে এই কথা ভেবে নিয়ে নগ্ন দেহে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসে। আমাদের লোকেরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেককে আক্রমণ করে তাদের প্রাচীরের ওপর থেকে বিতাড়িত করলে তাদের মধ্যে দুই তিন শ' লোক মেদিনী রায়ের আবাসে প্রবেশ করে এবং

সেখানে তারা প্রায় সকলেই পরস্পরকে এই ভাবে হত্যা করে। একজন তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, আর অন্যান্যরা তরবারির আঘাতের জন্য আগ্রহ করে গলা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে তাদের অনেকেই নরকে গমন করে।

আল্লার দয়ায় এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমার দখলে চলে আসে। কোনও রণবাদ্য বাজলো না। কোনও পতাকা উড়লো না। কোনও গুরুতর হাতাহাতি সংগ্রামও হলো না। বিধর্মীদের শির দিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরী করে চান্দেরির উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হলো। এই শত্রু দুর্গ জয় করার তারিখ পাওয়া গেল এই কথাগুলির মধ্যে 'ফথ-ই-ইদর-উল-হব' (৯৩৪)। আমি তখন এই কবিতাটি রচনা করি।

'শত্রুর আবাস ছিল—চান্দিরি,
বিধর্মীতে পূর্ণ ছিল—এই পুরী।
যুদ্ধ জয়ে এই দুর্গ অধিকারে এলো,
'ফথ-ই-ইদর-উল হব' জয়ের তারিখ হলো।'

চান্দেরি জায়গাটি বেশ ভাল, কারণ এর ধারে কাছে কয়েকটি জলাশয় আছে। দুর্গটি একটি পাহাড়ের ওপর। দুর্গের ভিতরে কঠিন পাথর খোদাই করা একটি জলাধার। 'দুতাহির' (দুই দেওয়ালে ঘেরা পথ) প্রান্তভাগে যেখানে আক্রমণ চালিয়ে আমরা দুর্গ অধিকার করি, একটি বড় জলাশয় আছে। চান্দেরির ছোট বড় সমস্ত বাড়ী পাথরে তৈরী। ধনীদের বাড়ী সযত্নে খোদাই করা পাথর দিয়ে আর নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীর পাথর অমন সুন্দর করে কাটা নয়। বাড়ীগুলির ছাতও মাটির টালির পরিবর্তে পাথরের চাপড়া দিয়ে ঢাকা। দুর্গের সামনে তিনটি বড় পুষ্করিণী। এগুলি পূর্ব্বতন শাসকরা আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে উঁচু জমির ওপর তৈরি করেছিল। এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে বেতওয়া নামে একটি ছোট্ট নদী আছে। হিন্দুস্থানে এই নদীর জল অত্যন্ত সুপেয় বলে খ্যাতি আছে। এই নদীটি সত্যই বেশ সুন্দর। নদীর জলের তলে খণ্ড খণ্ড পাথর আছে—যা দিয়ে ঘর তৈরী করা যায়। চান্দেরি আগ্রার দক্ষিণ দিকে হাঁটা পথে নব্বই ক্রোশ দূরে। চান্দেরি উত্তর অক্ষাংশের পঁচিশ ডিগ্রিতে অবস্থিত।

প্রথম জুমাদা মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার (৩০শে জানুয়ারি) আমরা দুর্গের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে মোল্লা খাঁয়ের পুষ্করিণীর ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামি। চান্দেরি অভিযানে আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, চান্দেরি জয়ের

পর আমরা বিধর্মী অধ্যুষিত ভূমি রায় সিং, ভিলসাই এবং সারংপুর অভিযানে যাব। এইগুলি বিধর্মী সালা উদ্দির অধীনস্ত রাজ্য। এইগুলি জয়ের পর রাণা সঙ্গর বিরুদ্ধে চিতোরের দিকে অগ্রসর হওয়ারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খারাপ সংবাদ আসায় বেগদের আহ্বান করে তাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই প্রথমে ব্যবস্থা করা উচিত। সুলতান নাসিরুদ্দিনের পৌত্র আমেদ সাকে চান্দেরির ভার অর্পণ করা হলো—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিল্লীর কোষাগারে সরাসরি পাঠাতে হবে। মোল্লা আসকারকে সৈন্য বিভাগের অধিনায়ক করে তাকে দুই তিন হাজার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি ফৌজ দিয়ে তার সেনাবল বৃদ্ধির জন্য বলা হলো।

এখানকার কাজ সমাপ্ত করে মোল্লা খাঁর পুষ্করিণীর ধার থেকে প্রথম জুমাদা মাসের ১১ তারিখ রবিবার উত্তর দিকে ফিরবার ইচ্ছা নিয়ে রওনা হলাম ও বুরহানপুর নদীর তীরে এসে থামলাম।

এই রবিবারেই ইয়াকুব খাজা ও জাফর খাজাকে কাল্পি থেকে নৌকা কানারের রাস্তার কাছে আনার জন্য বন্দির থেকে পাঠানো হলো।

এই মাসের ২৪শে তারিখ শনিবার কানারের পথের ধারে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি। তারপর সৈন্যদলকে নদী পার হতে আদেশ দেওয়া হয়।

এই সময় সংবাদ আসে যে সৈন্যদলকে আগে পাঠানো হয় তারা কনোজও ত্যাগ করেছে এবং রাপরিতে এসেছে। শত্রুপক্ষের একটি সুদৃঢ় দল সামসাবাদও অধিকার করেছে যদিও আবুল মহম্মদ নিশ্চয়ই এ স্থান সুরক্ষিত করেছিল। সৈন্যদলের নদী পার হতে প্রায় তিন চারদিন দেরী হয়ে গেল। নদী পার হওয়া শেষ হলেই আমরা কনোজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই এবং একদল সাহসী সৈন্যকে শত্রুপক্ষের সংবাদ আনার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিই। কনোজ থেকে কিছু দূরে যখন আমরা পৌছাই তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সংবাদ সংগ্রহকারী দলের কালো ছায়া দেখেই মারুফের পুত্র পালিয়ে দূরে চলে যায়। বিচন, বেজিদ ও মারুফ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গঙ্গা পার হয়ে কনোজের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব তীরে আমাদের রাস্তা বন্ধ করবে বলে ঘাঁটি স্থাপন করে।

শেষ জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ বৃহস্পতিবার আমরা কনোজ অতিক্রম করে গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে এসে অবতরণ করি। আমাদের কয়েকজন সাহসী

লোক নদীর উজান ও ভাটিতে যাতায়াত করে জোর করে ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা নিয়ে আসে। ভেলা প্রস্তুতকারক, মির মহম্মদকে একটি সাঁকো তৈরী করার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে এবং সাঁকোর জন্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। সে একটি স্থান নির্ব্বাচন করে ফিরে আসে। স্থানটি আমাদের শিবির থেকে মাইল খানেক দূরে। উৎসাহী ওভারসিয়ারদের সেতু তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। ওস্তাদ আলি কুলি তার কামান যেখানে সেতু তৈরী হবে তারই কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করে গোলা নিক্ষেপের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বাবা সুলতান ও দরবেশ সুলতান দশ পনেরো জন লোককে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য নমাজের সময় নৌকায় পার হয়ে যায়। তাদের এভাবে যাওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই ছিলনা। তারা সেখানে যুদ্ধ কিংবা আর কিছুই না করে পুনরায় ফিরে আসে। তাদের নদী পার হওয়ার জন্য আমি তিরস্কার করি। মালিক কাসিম মজিদ এবং অল্প সংখ্যক লোক দুই একবার নৌকায় ওপারে যায় এবং সেখানে শত্রুর দলের সঙ্গে সজ্ঘর্ষে প্রশংসাজনক কাজ করে। যেখানে সেতু তৈরী হচ্ছিল তারই নীচে নদীর মধ্য চর ভূমিতে একটি ছোট কামান স্থাপন করে গোলা বর্ষণ সুরু করা হয়। সেতুর চেয়েও উঁচু আত্মরক্ষার জন্য একটি মাটির বাঁধ তৈরী করে তার আড়াল থেকে গোলন্দাজগণ নিশানা করে কামান চালাচ্ছিল। অবশেষে মালিক কাসিম কয়েকজন অনুচর সহ শত্রুপক্ষের একটি দলকে পরাস্ত করে বিশ্বাসের আতিশয্যে তাদের হত্যা করতে করতে তাদের শিবির পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। শত্রুরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে একটি হাতি নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে। তার সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে' তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে নৌকায় চড়তে বাধ্য করে। কিন্তু নৌকায় চড়ে পালাবার আগেই হাতী এসে সেই নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালিক কাসিম মারা যায়। যে কয়দিন সেতু তৈরী হচ্ছিল, ওস্তাদ আলি কুলি খুব সুষ্ঠু ভাবে তার কামান চালায়। প্রথম দিনে আটবার, দ্বিতীয় দিনে ষোলোবার, তারপর তিন চার দিন সে এই ভাবেই গোলা চালিয়ে যায়। যে কামান সে চালাচ্ছিল—তার নাম দিগ্‌গজি অর্থাৎ বিজয়ী কামান। এটা সেই কামান যে কামান বিধর্ম্মী সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্যই কামানের ঐ নামকরণ করা হয়েছিল। এর চেয়েও আরও একটি বড় কামান স্থাপন করা হয়ে ছিল কিন্তু সেটা প্রথমেই আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে

যায়! গোলন্দাজগণ গোলা বর্ষণের কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে চালাতে থাকে। অন্যান্যদের সঙ্গে তারা সম্রাটের দুইজন ক্রীতদাস যারা কাজ করছিল এবং ঘোড়া সহ কয়েকজন পথিককেও বধ করে।

সেতু নির্ম্মাণের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দ্বিতীয় জুমাদা মাসের ১৯শে তারিখ বুধবার (১১ই মার্চ), সেতুর অপর প্রান্তে এসে শিবির স্থাপনের জন্য তৈরী হই। আফগানরা গঙ্গার ওপর আমাদের সেতু তৈরী করার চেষ্টাকে একটা কৌতুককর ব্যাপার বলে মনে করে এবং এটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ১১ই মার্চ বুধবার সেতু নির্ম্মাণের কাজ শেষ হলে আমাদের কিছু পদাতিক ও লাহোরি সৈন্য সেতুপার হয়ে এলে শত্রুদের সঙ্গে একটা ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়। শুক্রবার আমার নিজস্ব শিবিরের সৈন্য, আমার বাছাই করা সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য নদী পার হয়ে আসে। আফগানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অশ্বারোহণ করে হাতী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার সৈন্যদের আক্রমণ করে। এক সময় তারা আমার বাম ভাগের সৈন্যদের মনে যুদ্ধ জয় করছে এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন্দ্রের এবং দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা অবিচলিতভাবে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান করে এবং অবশেষে তারা শত্রু সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে। দুইজন প্রচণ্ড আবেগের বশে চালিত হয়ে দলছাড়া হয়ে এগিয়ে যায়। তাদের এক জনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে শত্রুপক্ষ সেই স্থানেই বধ করে। আর একজন এবং তার ঘোড়াটিও দেহের নানাস্থানে আঘাত পায়। এই ঘোড়াটি ছিল দুর্বল ও রুগ্ন। কোনও রকমে উদ্ধার পেয়ে নিজ ঘাটির মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েই মাটিতে পড়ে যায়।

সেইদিন সাত আটটি দেহচ্যুত শির আমার কাছে আনা হয়। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরে এবং বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। অপরাহ্ন নমাজের সময় পর্য্যন্ত সঙ্ঘর্ষ প্রবলভাবে চলতে থাকে। সারা রাত্রি ধরে সেতুর উপর দিয়ে যারা নদীর অপর পারে ছিল তাদের নিয়ে আসা হয়। যদি সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার অবশিষ্ট সৈন্যকে এপারে আনা যেত তাহলে হয়তো শত্রুপক্ষের সকলকেই আমাদের হাতে পড়তে হতো। কিন্তু আমার মনে এই খেয়াল চেপেছিল যে—গত বৎসর নববর্ষের দিনে আমি সিক্রি থেকে সঙ্গর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলাম—সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার এবং আমার শত্রুকে শনিবার দিন পরাভূত করি। এই বৎসরও ঠিক নববর্ষের দিনই এই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করায়

জন্য যাত্রা করি—সে দিন ছিল বুধবার। যদি তাদের রবিবারে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি তাহলে এই দুই যুদ্ধের ব্যাপারে দিন হিসাবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকবে। সেই জন্যই আমি সৈন্য চালনা করতে বিলম্ব করেছিলাম।

১৪ই মার্চ শনিবার শত্রুপক্ষ কোনও সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই। তারা দূরে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবস্থান করছিল। সেই দিনই গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার এবং পরদিন সকালেই সৈন্য দলকে সেতু পার হওয়ার আদেশ দিই। প্রভাতী ডঙ্কা বাজার সময় অগ্রগামী প্রহরীদের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শত্রুরা পালিয়েছে। আমি চিন্ তাইমুর সুলতানকে শত্রুপক্ষের সন্ধানের জন্য সৈন্য দলের পুরোভাগে যেতে আদেশ করি এবং মহম্মদ আলি জং জং, হুসেনুদ্দিন আলি খলিফা, মুজিব আলি খলিফা, কোকি বাবা কাস্কে, দোস্ত মহম্মদ বাবা কাস্কে এবং কিজিলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাদের এই নির্দেশ দিই—যেন তারা শত্রুপক্ষের পিছনে ধাওয়া করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং আমার এই আদেশ যেন তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

সকাল বেলার নমাজের সময় আমিও পার হয়ে আসি। নদীর ভাটিতে যেখানে জল কম, এমন একটা জায়গার সন্ধান করে সেখান দিয়ে উটগুলোকে পার করে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। রবিবার দিন বেঙ্গারমনের এক ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ের ধারে শিবির ফেলি। শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে যে দলকে পাঠাই, তারা মোটেই তাদের কাজে সফল হতে পারে না। তারাও এই জায়গাতেই এসে থেমেছিল এবং সেই দিনই (রবিবার) দুপুরের নমাজের সময় সেখান থেকে আবার যাত্রা করি। পরদিন সকালে বেঙ্গারমনের সম্মুখে একটা পুকুরের পারে এসে শিবির স্থাপন করি। সেই দিনই আমার মাতুল ছোটখাঁয়ের পুত্র তুখ্তে বুঘা সুলতান আমার সঙ্গে দেখা করে। শেষ জুমাদা মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার (২১শে মার্চ) আমি লক্ষ্ণৌ পৌঁছাই এবং স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করে গোমতি নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি। *সেই দিনই গোমতি নদীতে স্নান করি। জানিনা, কি কারণে, আমার কানে জল ঢোকার জন্যই হোক, না হয় ঠাণ্ডা লাগার জন্যই হোক আমার ডান কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না—যদিও সেটা খুব কষ্ট দেয়নি।

আমরা তখনও অযোধ্যা থেকে কিছুদূরে ছিলাম (অযোধ্যা নগরী গোগরা নদীর দক্ষিণ তীরে, গোগরা ও সরযূ নদীর সঙ্গম স্থানের কিছু ভাটিতে অবস্থিত)। সেই সময় চিন্ তাইমুর সুলতানের নিকট থেকে একটা দূত এই

বার্ত্তা নিয়ে আসে যে শত্রুরা সরযূ নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছে এবং সে তার সৈন্যদল পুষ্ট করার জন্য আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে। তার সাহায্যের জন্য কেন্দ্র ভাগের সৈন্যদের মধ্যে কাজাকের অধিনায়কত্বে এক হাজার বাছাই করা সৈন্য পাঠাই। রজব মাসের ৭ই তারিখ শনিবার (২৮শে মার্চ) গোগরা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অযোধ্যার দুই তিন ক্রোশ ওপরের দিকে শিবির স্থাপন করি। সেই দিন পর্য্যন্ত অযোধ্যার অদূরে সরযূ নদীর অপর পারে সেখ বেজিদ ঘাঁটি করে ছিল। সে আপোষ প্রস্তাব করে সুলতানের কাছে একটা চিঠি লেখে। সুলতান তার কপটতা বুঝতে পেরে মধ্যাহ্নে নমাজের সময় একজন লোককে কাজাকের কাছে পাঠায় তাকে সাহায্য করার জন্য এবং নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে থাকে। কাজাক সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে মিলিত হলে তারা কাল বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে যায়। অপর পক্ষের পনেরোটি ঘোড়া ও তিন চারটি হাতি ছিল। কিন্তু তারা তাদের ঘাঁটি রক্ষা করতে না পেরে পালাতে শুরু করে। আমার লোকেরা তাদের কয়েকজনকে ধরে মাথা কেটে ফেলে এবং সেই মাথাগুলো আমার কাছে পাঠায়। সুলতান নদী পার হওয়ার পরই বেয়ানুফ সুলতান, তারাদ বেগ, কুচ বেগ, বাবা চিরে ও বাকি সাঘাওয়েল নদী পার হয়ে যায়। যারা প্রথমে নদী পার হয় তারা সান্ধ্য নমাজের সময় পর্য্যন্ত সেখ বেজিদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। সে সেই সময়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। চিন্ তাইমুর সুলতান সেইরাত্রে একটা জলাশয়ের ধারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মধ্যরাত্রে আবার শত্রুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। চল্লিশ ক্রোশ ধাওয়া করার পর সে এক জায়গায় এসে বুঝতে পারে যে শত্রুপক্ষের পরিবার ও অনুচরবর্গ সেখানেই ছিল, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই দ্রুত বেগে পালিয়েছে। হালকা বাহিনী নানা দলে বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছাড়িয়ে পড়লো। বাকি সাঘাওয়াল এক ডিভিসন সৈন্য নিয়ে অনুসরণ করতে করতে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি এসে তাদের পরিবারবর্গ ও অনুচরদের ধরে ফেলে এবং কয়েকজন আফগানকে বন্দী করে।

অযোধ্যার এবং নিকটবর্ত্তী দেশগুলি শাসনের বিধি ব্যবস্থা করবার জন্য ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করি। (অযোধ্যার সাতআট ক্রোশ ওপরের দিকে সরযূ নদীর তীরে একটি বিখ্যাত শিকারের স্থান আছে।) আমি গোগরা ও সরযূ নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য মির মহম্মদ জালেকবানকে পাঠাই

এবং সে নদী পার হওয়ার জায়গা স্থির করে আসে। ১২ই তারিখ বৃহস্পতি-বার, (২রা এপ্রিল) শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

[এই বৎসরের অর্থাৎ হিজ্‌রি ৯৩৫ সালের (ইংরাজী ৩রা এপ্রিল থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) আর কোনও ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। এমন কি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে কোনও রূপ আলোকপাত করতে পারেন নি।]

মহরম মাসের ৩রা তারিখ শুক্রবার (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫২৮) আসকারি (বাবরের তৃতীয় পুত্র, বয়স—১০ এবং মুলতানের গভর্ণর) এসে পৌঁছায়। তাকে চান্দেরি অভিযানের পূর্ব্বেই মুলতানের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার নিজের কক্ষে দেখা করি।

ইউনুস আলির বিশেষ বন্ধু—ঐতিহাসিক খন্দ আমির, হেঁয়ালীকার মৌলনা সাহেব, কানুন বাদক (কানুন—একরকম তারের বাদ্যযন্ত্র) মির ইব্রাহিম অনেকদিন পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হেরি থেকে এসেছেন। পরদিন সকালে তাঁরা আমার সাক্ষাৎ করলেন।

এই মাসের ৫ই তারিখ, রবিবার (সেপ্টেম্বর—২০) গোয়ালিয়ার পরিদর্শনের জন্য যমুনা নদী পার হয়ে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করি। সেখানে ফকর-জাহান বেগম ও খাদিজা-বেগমের সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের দুই তিন দিনের মধ্যেই কাবুলে যাওয়ার কথা। তাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করে আমি যাত্রা শুরু করি। মহম্মদ জেমান মির্জা আমার কাছে অনুমতি নিয়ে আগ্রাতেই থেকে যায়। সন্ধ্যায় চার পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে আমি একটি বড়পুকুরের ধারে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ভোরের নমাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেরে নিয়ে আবার রওনা হই। দুপুর বেলাটা গাম্বির নদীর তীরে কাটিয়ে সেখানে মধ্যাহ্ন নমাজ সমাপন করে আবার বেরিয়ে পড়ি।

মোল্লা রাফা আমার শারীরিক বলরক্ষার জন্য যে ঔষধ তৈরী করেছিল ও যেটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম সেই ওষুধ তালকানে এসে খাই। পথে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে এগুতে হচ্ছিল এবং সেজন্য বিশেষ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমার শারীরিক গ্লানি দূর করার জন্য মোল্লা রাফার গুঁড়ো ওষুধ খেতে হয়। ওষুধটা খেতে বিস্বাদ এবং বমির ভাব এনে দেয়।

ঢোলপুরের একক্রোশ মধ্যে যে জায়গায় আমি একটি উদ্যান ও প্রাসাদ তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা একটা পাহাড়েরে গায়ে। আমি সেইখানে অপরাহ্ন নমাজের সময় এসে যাই। পাহাড়ের প্রান্তে কালো শক্ত পাথরে ছাওয়া একটা খাড়াই। আমি সেই পাহাড় কেটে সমতল করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। একটা শক্ত প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গেলে তা দিয়ে যদি একটি কক্ষ খোদাই করা সম্ভব হয় তাহলে সেই ভাবে সেইটি করা এবং যদি পাথরের গভীরতা বেশী না হয় তাহলে পাথর কেটে ফেলে সমতল করে সেখানে একটি পুকুর খনন করতে নির্দেশ দিই। পাহাড়ে খুব উঁচু পাথর না পাওয়ার একটা বড় পাথরে ঘর খোদাই করা সম্ভব হলো না। সেইজন্য আমার পাথর খোদাইকার ওস্তাদ সা মহম্মদকে একটি আটকোণা ঢাকা জলাধার—সমতল করা পাথরের পাটাতনের ওপর তৈরী করতে আদেশ দিই। পাথর খোদাইকারদের বিশ্রাম না নিয়ে একটানা এই কাজ করতে বলা হয়। যে জায়গায় আস্ত পাথর খোদাই করে জলাধার নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি, সেখানে অনেকগুলো আম, জাম এবং আরও নানারকমের গাছ আছে। এই গাছগুলোর মাঝখানে দশ হাত লম্বা দশ হাত চওড়া একটি ইঁদারা খনন করতে আদেশ দিই এবং এ কাজ প্রায় শেষ হয়। যে জলাধারের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়ছে, তাতে এই ইঁদারা থেকে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ইঁদারার উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান সিকদার একটি উঁচু স্তূপ খাড়া করে তার উপর কয়েকটি ঘর নির্মান করে। স্তূপের মাথায় বর্ষার জল সঞ্চিত হয়ে একটা বড় পুষ্করিণী তৈরী হয়ে যায়। এই পুকুরটি একটি পাহাড়ে ঘেরা এবং পূর্ব্বে একটি উদ্যান। আমি আদেশ দিই যে বিশ্রামের জন্য পুকুরের পূব দিকে আস্ত পাথর কেটে একটা পাটাতন এবং কতকগুলো বসবার আসন যেন তৈরী করা হয়। পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ তৈরীরও নির্দেশ দিই।

মঙ্গল ও বুধবার সমস্ত দিন এইসব কাজের তদারক ও নির্দেশ দেওয়ার জন্য এইখানে অবস্থান করি। বৃহস্পতিবার আবার রওনা হয়ে চম্বল নদী পার হই। দুপুরের নমাজের সময়টা আমি নদী তীরেই কাটাই এবং তারপর দুপুর ও বিকেলের নমাজের মাঝামাঝি সময় আবার ঘোড়ায় চড়ে নদী তীর ছেড়ে যাই। সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের সময়ের মধ্যে কাওয়ারি নদী পার হয়ে বিশ্রামের জন্য থামি। বৃষ্টিতে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ঘোড়াগুলোকে

সাঁতারিয়ে পার করানো হয়। আমরা নৌকোয় পার হই। পরদিন সকালে মহরম মাসের ১০ই তারিখ শুক্রবার ইদ-এ-আসুরা (উপবাসের দিন) উদযাপন করে আবার যাত্রা সুরু করি। দুপুর বেলাটা একটা গ্রাম্য রাস্তার ওপর কাটাই। রাতের নমাজের সময় চারবাগে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

চারবাগ উদ্যানটি গোয়ালিয়রের এক ক্রোশ উত্তরে। গত বৎসর এই উদ্যান রচনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সকালে দুপুরের নমাজের আগেই আবার রওনা হই এবং উঁচু টিপির দিকে অগ্রসর হই। (গর্ণটনের গেজেটিয়ারে আছে—এই উঁচু টিপিটি উত্তর দিকে মোচার আকারের একটা পাহাড়—আর চার ধার ঘিরে আছে চমৎকার পাথরের অট্টালিকা—যেটা নিঃসন্দেহে একটি হিন্দু-মন্দির)। এই স্থানটি গোয়ালিয়রের উত্তরে। জায়গাটি, মন্দির এবং উপাসনা-গৃহ দেখে আমি 'হাতিপুল' ফটক দিয়ে গোয়ালিয়রে প্রবেশ করি। সেটা মান্‌সিংয়ের প্রসাদ সংলগ্ন। [হাতিয়াপুর—উত্তর পূর্ব্ব দিকের ছয়টি ফটকের মধ্যে একটি। এই ফটক মানসিং (১৪৮৮—১৫২১) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।] সেখান থেকে বিক্রমজিতের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হই। এইখানে রহিমদাদ বাস করতেন। বিকেলের নমাজের সময় আমি এখানে পৌছাই। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে আমার কানের ব্যথার জন্য একটু আফিং খাই। (ভারতবাসী এবং পারশ্যবাসীদের ধারণা--চাঁদের আলো শীতল। ভারতবাসীদের জ্যোৎস্নাহত হওয়ার বিশেষ ভীতি আছে। তাদের ধারণা আফিং খেলে এর কুফল দূর হয়)।

পরদিন সকালে আফিং খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়। আমি অনেকখানি বমি করে ফেলি। এই অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি মানসিং ও বিক্রমজিতের প্রাসাদগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। এই প্রসাদগুলি বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্তভাবে নির্ম্মিত হলেও খুবই সুন্দর। প্রসাদগুলি খোদাই করা পাথরে তৈরী। মান্‌সিংয়ের প্রাসাদ অন্য রাজার প্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু ও সুন্দর।

মানসিংয়ের প্রাসাদের একটা দেওয়ালের অংশ পূর্ব্বমুখী। এই দেওয়ালটি অবশিষ্ট দেওয়ালের চেয়ে বেশী কারুকার্য্যময়। এর উচ্চতা ৪০।৫০ গজ ও খোদাই পাথরে তৈরী। সম্মুখ ভাগে সাদা চুন বালির আস্তরণ। প্রাসাদটি অনেক জায়গায় চারতলা। নীচের দুইতলা খুব অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণ বসবার পর অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে এবং সব জিনিষ পরিষ্কার দেখা যায়। আমি এই সব জায়গা একটা আলো সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখি। প্রাসাদের একদিকে

পাঁচটি গম্বুজ তামার পাতে মোড়া। দেওয়ালগুলির বহির্ভাগ সবুজ রংয়ের টালি দিয়ে ঢাকা। সমস্ত দিকের প্রাচীরই কলাগাছের ছবি আঁকা টালি দিয়ে সজ্জিত।

পূর্ব দিকের উঁচু বুরুজের নীচেই হাতিপুল। ভারতীয়রা হস্তীকে বলে হাতি, আর পুল মানে ফটক। এই ফটকের বাহিরে একটি হাতির মূর্ত্তি, তার পিঠের ওপর দুইটি মাহুতের মূর্ত্তি। হাতির মূর্ত্তিটি দেখতে ঠিক জীবন্ত হাতির মত। এই জন্যই একে হাতিপুল বলা হয়। মানসিংয়ের চারতলা প্রাসাদের নীচতলার একটি জানালা হাতির মূর্ত্তির নিকটেই; সেই জানালা দিয়ে সরাসরি এই মূর্ত্তি দেখা যায়। উপরতলায় পূর্ব্ববর্ণিত গম্বুজের মত ঐ একই রকমের ছোট গম্বুজ আছে। তিনতলাতে বসবার কক্ষ। চার তলা থেকে নীচের তলাগুলিতে আসা যায়। নীচের তলাটি মাটির নীচে। এই প্রসাদ নির্ম্মাণে হিন্দুস্থানের সমস্ত উদ্ভাবনী কৌশল ব্যয় করা হয়েছে। এর কক্ষগুলিও অস্বাচ্ছন্দ্যকর নয়।

মানসিংয়ের পুত্র বিক্রমজিতের প্রাসাদ দুর্গের উত্তর দিকে একটি খোলা জমির মাঝখানে। পুত্রের প্রাসাদের কিন্তু পিতার প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা চলে না। প্রাসাদে একটি বড় গম্বুজ, কিন্তু তার নীচে অত্যন্ত অন্ধকার, যদিও কিছুক্ষণ থাকলে চেষ্টা করে কিছু কিছু দেখা যায়। বড় গম্বুজের নীচে একটি ছোট কক্ষ —তাতে কোন দিক থেকেই আলো প্রবেশ করে না। রহিমদাদ যখন বিক্রমজিতের প্রাসাদ তাঁর বাসস্থান ঠিক করেন, সেই সময় এই গম্বুজের ওপর একটি পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিতের প্রাসাদ থেকে তার পিতার প্রাসাদে যাওয়ার জন্য একটি গুপ্ত পথ আছে। সে পথ বাহির দিক থেকে চোখে পড়ে না। এমন কি প্রাসাদে ঢুকলেও কোন্ দিকে সেই গুপ্ত পথ তাও বোঝা যায় না। কতক জায়গা দিয়ে সেই গুপ্ত পথে আলো প্রবেশ করে। এই পথটি সত্যই অসাধারণ।

প্রাসাদগুলো দেখে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে রহিমদাদ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাভবন দেখতে যাই। দুর্গের দক্ষিণে পুকুরের ধারে তিনি যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেটা ঘুরে দেখে আমি অনেক দেরীতে চারবাগে পৌঁছাই। এইখানে আমার অনুচরবর্গ শিবির ফেলেছিল। চারবাগে অনেক রকমের ফুল—বিশেষ করে অসংখ্য মনোরম রক্তকরবী। গোয়ালিয়রের করবী সুন্দর লাল রংয়ের। আমি কয়েকটি লাল করবীর চারা এখান থেকে সংগ্রহ করে আগ্রার উদ্যানে রোপন করি। বাগানের দক্ষিণ দিকের পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড জলাধার। বর্ষার বৃষ্টিপাতে সেই জলাধারে জল জমে। জলাধারের পশ্চিমে একটি উঁচু

(দেব মন্দির। সুলতান সামসুদ্দিন আলতামাস এই মন্দিরের গা ঘেঁষে একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করেছিলেন) দেব-মন্দিরটি সত্যিই খুব উঁচু। দুর্গ এলাকায় এইটিই সব চেয়ে উঁচু অট্টালিকা। ঢোলপুরের পাহাড় থেকে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং এই মন্দির পরিষ্কার দেখা যায়। শোনা যায় এই মন্দির নির্মাণের সমস্ত পাথর বড় পুষ্করিণী খননের সময় সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট উদ্যানে স্তম্ভের ওপর নির্মিত একটি দেওয়ালহীন মনোরম বৃহৎ কক্ষ। হিন্দুস্থানের রীতি অনুযায়ী তৈরী ফটকের সামনে বিশেষত্বহীন নীচু দরদালান।

পরদিন সকালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) দুপুরের নমাজের সময় গোয়ালিয়রের যে সব জায়গা দেখি নাই তা দেখবার জন্য বের হলাম। মানসিংয়ের দুর্গের বাদিয়ে বুদালগার নামে প্রাসাদটিকে প্রথমে যাই। এই প্রাসাদ দেখে হাতিপুল ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আদোয়া নামে একটি স্থান দেখতে গেলাম। 'আদোয়া' -দুর্গের পশ্চিম দিকের একটি উপত্যকা। যে প্রাচীরটি পাহাড়ের মাথা ঘিরে টানা হয়েছে, উপত্যকাটি তার বাহিরে হলেও একটির ভিতরে আর একটি এইরূপ দুইটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে উপত্যকার মুখ আবৃত। দেওয়ালগুলির উচ্চতা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ। ভিতরের প্রাচীরটি বেশী লম্বা ও উঁচু এবং এর দুই প্রান্ত দুর্গ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত। এই প্রাচীরের মাঝামাঝি আর একটি নীচু প্রাচীর -কিন্তু সেটা তেমন প্রতিরোধ-ক্ষম নয়। জলাধারের দিকে যাওয়ার জন্য রাস্তার আবরণ হিসাবে এটি তৈরী হয়েছে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি কূপ। উপর থেকে জল পর্য্যন্ত দশ পনরোটি সিঁড়ি। রাস্তাটি বড় দুর্গ প্রাচীর থেকে আরম্ভ হয়ে ছোট প্রাচীরের মাঝামাঝি যে কূপটা আছে তার পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে। ফটকের উপরে সুলতান সামসুদ্দিনের নাম খোদাই করা প্রস্তর ফলক। বৎসর লেখা আছে—৬৩০। বাহিরের দুর্গপ্রাচীরের নিকট একটি বড় পুকুর। এটা খুব ভাল পুকুর নয়। এর জল প্রায় শুকিয়ে যায়। নল দিয়ে পুকুরের জল দুর্গের মধ্যে নেওয়া যায়। আদোয়া উপত্যকার মাঝামাঝি আরও দুইটি বড় পুষ্করিণী। এখানকার লোকেরা এই দুইটি পুকুরের জলের খুব তারিফ করে। তিন দিকে খাড়া পাহাড়। পাথরের রং বিয়ানার পাথরের মত, যদিও ততটা লাল নয়—কিছু ফিকে। আদোয়ার ধারের পাহাড়ের কঠিন পাথর খোদাই করে ছোট ও বড় অনেক মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিশ গজ লম্বা একটি বৃহৎ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি একেবারে নগ্ন -এমন কি জননেন্দ্রিয় ঢাকার জন্যও

কোনও আবরণ নাই। আদোয়া উপত্যকার মধ্যের দুইটি পুষ্করিণীর চারদিকে কুড়ি পঁচিশটা কূপ এরা খনন করেছে। এরা অনেক গাছ ও ফুলের চারাও এখানে রোপন করেছে। এই জল দিয়েই গাছগুলিতে সেচের কাজ করা হয়। আদোয়া মোটেই খারাপ জায়গা নয়, বরং অত্যন্ত মনোরম স্থান। এর সব চেয়ে বড় দোষ হলো চারিদিকের দেবমূর্ত্তি।)(মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস করার জন্য আমি আদেশ দিই।) আদোয়া থেকে দুর্গে ফিরে এসে আমি সুলতান পুলে যাই—যার দরজা বিধর্ম্মীদের আমল থেকে বন্ধ আছে। সন্ধ্যা নমাজের পর রহিমদাদের তৈরী উদ্যানে যাই। সেখানেই রাতটা কাটাই।

পরদিন মঙ্গলবার (২৯শে সেপ্টেম্বর) সঙ্গর দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমজিতের কাছ থেকে এক পত্রবাহক এখানে আসে। সে আর তার মা পদ্মাবতী তখন রণতামভরে ছিল। আমার গোয়ালিয়র যাত্রার পূর্ব্বেই বিক্রমজিতের অতীব বিশ্বাসভাজন আশুক নামে একজন হিন্দু আমার কাছে দূত হিসাবে তার আনুগত্য ও বশ্যতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। তার আশা এই যে, সে বাৎসরিক সত্তর লাখ টাকা বৃত্তি হিসাবে আমার কাছ থেকে পাবে। তখন একটি চুক্তি সম্পাদন হয় এবং ঠিক হয় যে সে রণতামভর দুর্গ আমাকে ছেড়ে দেবে। তার পরিবর্ত্তে তাকে এমন কতকগুলো পরগণা দেওয়া হবে—যার আয় সত্তর লক্ষ টাকা। এই ব্যবস্থা করে তার দূতকে ফিরে পাঠিয়ে দিই। যখন আমি গোয়ালিয়র পরিদর্শন করতে যাত্রা করি, তখনই তাকে গোয়ালিয়রে তার লোককে পাঠানোর জন্য জানিয়ে দিই। কিন্তু তারা ধার্য্য তারিখের কয়েকদিন পরে এখানে আসে। হিন্দু আশুক পদ্মাবতীর নিকট-আত্মীয়। সে বিক্রমজিতের মা ও বিক্রমজিৎকে সমস্ত কথাই বুঝিয়ে বলে। আশুকের মনোভাব তারা সমর্থন করে। তারা যথারীতি আমার বশ্যতা স্বীকার করে ও আমার প্রজাশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের গণ্য করতে রাজি হয়। যখন রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করে (১৫১৯) সেই সময় সুলতানের মাথায় যে মণি মাণিক্যখচিত মুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ ছিল তা এই বিধর্ম্মীর হাতে পড়ে। সুলতান মামুদকে মুক্তি দেওয়ার সময় সে দুটি সে নিজে রেখে দেয়। এই জিনিষ দুটি বিক্রমজিতের কাছে ছিল। তার বড় ভাই রতনসেন পিতার উত্তরাধিকারী রূপে রাণা হয় এবং চিতোরের সিংহাসন অধিকার করে। সে তার ছোট ভাইয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে এই ইচ্ছা জানায় যে, সে যেন ঐ জিনিষটি তাকে অর্পণ করে। কিন্তু বিক্রমজিত তাতে অস্বীকৃত হয়। যে লোকগুলিকে সে আমার কাছে পাঠায় তাদের সঙ্গে

সেই রাজমুকুট ও সোনার কোমরবন্ধ আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার অনুরোধ ছিল যেন রণতামভরের পরিবর্ত্তে তাকে বিয়ানার ভার দেওয়া হয়। আমি তাদের বিয়ানার দাবী প্রত্যাহার করিয়ে নিয়ে রণতামভরের সমতুল্য সামসাবাদ দেওয়া স্থির করি। এই দিনই আমি তাদের সম্মানসূচক পোষাক দান করে এবং নয় দিনের মধ্যে বিয়ানাতে আমার সঙ্গে দেখা করবার দিন ঠিক করে বিদায় দিই।

আমি বাগান থেকে গোয়ালিয়রের দেব মন্দিরগুলি দেখতে যাই। অনেকগুলি মন্দির দুই-তিন-তলা উঁচু। তবে প্রতি তলাই আগেকার রীতি অনুসারে নীচু নীচু। মন্দিরের নীচু অংশগুলিতে পাথরে-খোদাই-করা দেবমূর্ত্তি। চার দিকে অসংখ্য দেব-মন্দির—ঠিক বিদ্যাভবনের কক্ষগুলির মত। সম্মুখে একটি বড় ও উঁচু গম্বুজবিশিষ্ট অট্টালিকা। এর কক্ষগুলি বিদ্যাভবনের ছোট ছোট কুঠুরির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি কক্ষের উপর পাথর কেটে তৈরী ছোট গম্বুজ। নীচে পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি। এই সব দেখে আমি গোয়ালিয়রের পশ্চিম ফটক দিয়ে বের হয়ে দুর্গের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে হতে সেখানকার ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করে যেখানে রহিমদাদ চারবাগউদ্যান রচনা করেছিল সেইখানে হাতিপুল ফটকের কাছে ঘোড়া থেকে নামি। চারবাগে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য রহিমদাদ অপেক্ষা করছিল। আমাকে সে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়ায়। তারপর নগদে ও জিনিষপত্রে চারলাখ টাকার মত মোটা নজরানা দেয়। এই চারবাগ থেকে রওনা হয়ে অনেক রাত্রে চারবাগের যে অংশে আমার থাকার শিবির ছিল সেখানে পৌঁছাই।

১৫ই তারিখ বুধবার (২০শে সেপ্টেম্বর) গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বে দেড় ক্রোশ দূরে একটি জলপ্রপাত দেখতে যাই। খুব ভোরে শিবির ত্যাগ করে মধ্যাহ্ন নমাজের পরে সেই প্রপাতের কাছে পৌঁছাই। জলস্রোত এমন যে তার বেগে একটা পেষণ যন্ত্র চালানো যেতে পারে। সাত আট গজ লম্বা একটা খাড়া পাথরের উপর জল ঠেলে উঠ্‌ছে। প্রপাতের নীচে একটি বড় পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছে। আরও উপরের দিকে দেখা যায়, একটি পাথরের উপর জলঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে নেমে আসছে। সেই জলস্রোত একটা পাথরের চাঁইয়ের নীচে গড়িয়ে পড়ছে, আর এই জলধারায় নানা জায়গায় পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। জলধারার দুই দিকের ভূমিতে কঠিন পাথরের টুকরো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলো বসবার আসন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রপাতের

জলধারা কিন্তু সব সময় বয় না। জলপ্রপাতের ওপরের দিকে আমরা বসি এবং মাজুন (এক প্রকারের উত্তেজক মোদক অথবা অরিষ্ট) খাই। তারপর জলধারার উৎস দেখার জন্য আরও উপরে উঠি এবং পরে নেমে আসি। তারপর আমরা একটা উঁচু টিলায় চড়ে সেখানে কিছু সময় কাটাই। সেই সময় বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা বাজনা বাজায়, আর গায়েকরা গান গায়। আমাদের মধ্যে যারা আবলুস গাছ দেখেনি—যে গাছকে এখানকার অধিবাসীরা বলে 'তিন্দু'—তারা এইবার সে গাছ দেখবার সুযোগ পেলো। এই স্থান ত্যাগ করে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম—তারপর ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যে ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময় একটা জায়গায় নেমে সেইখানে ঘুমিয়ে নিই। পরদিন ভোর ছয়টা বাজতে না বাজতেই আমরা চারবাগে পৌঁছে যাই।

১৭ই তারিখ শুক্রবার (২রা অক্টোবর) সিলাদ্দির জন্মস্থান 'সুখজানে' দেখতে যাই। (সিলাদ্দি—রাইসেনের রাজা ও রাণা সঙ্গর জামাতা। খানুয়ার যুদ্ধে হিন্দু জমায়েতের একজন সদস্য হিসাবে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।) এই গ্রামের কাছে পাগাড় লেবু ও সীতা-ফলের বাগান আছে। সেই বাগান ঘুরে দেখে আমি রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই শিবিরে ফিরে আসি।

১৯শে তারিখে রবিবার সূর্যোদয়ের আগেই আমি চারবাগ থেকে যাত্রা করি। কাবেরী নদী পার হয়ে দুপুরের নমাজের সময় থামি। তারপর আবার ঘোড়ায় চড়ি। সূর্যাস্তের সময় চম্বল নদী পার হয়ে সন্ধ্যা ও রাতের নমাজের মাঝামাঝি সময়ে ঢোলপুর দুর্গে পৌঁছাই। লণ্ঠনের আলোতে আবুল ফতের তৈরী স্নানাগার দেখি। তারপর বাঁধের কাছে যে জায়গায় নতুন চারবাগ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলাম সেইখানে এসে রাত কাটাই। যে সব কাজ করার আমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম সেই সব কাজ পরদিন সকালে দেখি। এই সোমবারেই আমি মাজুন খাওয়ার বৈঠক করি। মঙ্গল ও বুধবারেও এইখানেই থাকি। বুধবার সন্ধ্যায় আমি উপবাস ভঙ্গ করি এবং অল্প কিছু খাই। সিক্রি যাওয়ার জন্য মাঝরাতে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছিয়ে শয্যা গ্রহণ করি। আমি লক্ষণ দেখে বুঝলাম যে কানে ঠাণ্ডা লেগেছে। সে রাতে এমন কষ্ট হয়েছিল যে ঘুমোতে পারি নি।

পরদিন ভোরে আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। এক প্রহরের মধ্যেই সিক্রিতে যে বাগান তৈরী করেছিলাম সেইখানে পৌঁছে যাই। বাগানের প্রাচীর ও কূপের ভেতরের ঘরের কাজ আমার পছন্দ মত না হওয়ায় এই কাজের ভারপ্রাপ্ত

ওভারসিয়ারদের তিরস্কার করি এবং শাস্তি দিই। অপরাহ্ন এবং সান্ধ্য নমাজের মধ্যবর্তী সময় আমি সিক্রি ত্যাগ করি। মাধাকর অতিক্রম করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর পুনরায় যাত্রা সুরু করে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই আগ্রা পৌছে যাই। এখানে এসে আমি খাদিজা সুলতান বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ফকর জাহান বেগম এখান থেকে চলে গেলেও ইনি নানা কাজের জন্য এখানে থেকে যান। (এই দুই মহিলা আবুসৈয়দ মির্জার কন্যা এবং বাবরের পিসিমা)। তারপর আমি যমুনা পার হয়ে হাসত-বেহেস্ত উদ্যানে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

সফর মাসের ৫ই তারিখে সোমবার (১৫ই অক্টোবর) আমি বিক্রমজিতের প্রথম দূত এবং যে শেষে আমার কাছে এসেছিল তাদের সঙ্গে বেড়ের হিন্দু অধিবাসী দিউরের পুত্র আমার অনেক দিনের কর্মচারী হাবেশিকে পাঠাই বিক্রমজিতের কাছে। সে আমার পক্ষ থেকে রণতামভরের দখল এবং বিক্রম-জিতের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে ও উভয় পক্ষের রীতি অনুযায়ী সন্ধিপত্র সম্পাদন করার ব্যবস্থা করবে। এই কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সে যেন সেখানে উপস্থিত হয়ে ওখানকার পরিবেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে এবং যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। যদি সেই নবীন রাজপুত্র তার শর্তগুলি পালন করে, তাহলে আমিও আল্লার আশীর্বাদে তাকে তার পিতার স্থলে রাণা করে চিতোরের সিংহাসনে বসাব।

এই সময়ে দিল্লী ও আগ্রার দাদাক্ষিখানায় ইস্কান্দার ও ইব্রাহিমের সঞ্চিত মুদ্রা নিঃশেষ হওয়ায় এবং অবিলম্বে সৈন্যদের জন্য সাজসজ্জা, বন্দুক কামানের জন্য বারুদ এবং গোলন্দাজ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন হওয়ায় আমি সফর মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার সমস্ত বিভাগে এই আদেশ জারি করি যে, প্রত্যেক লোক যে বার্ষিক কর দেয় তাকে ধার্য্য করের অতিরিক্ত শতকরা ত্রিশ টাকা বেশী দেওয়ানখানায় জমা দিতে হবে এবং এই অতিরিক্ত রাজস্ব সৈন্যসংগ্রহ, যথাযথভাবে সৈন্যদের সাজসজ্জা এবং রসদের জন্য খরচ হবে।

১০ই তারিখ শনিবার সা' কাশিম নামে সুলতান মহম্মদ বকসির একজন পত্র বাহককে—যাকে পূর্ব্বেও আমি খোরাসানবাসীদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে পাঠিয়েছিলাম—তাকেই আবার নিম্নলিখিতভাবে চিঠি দিয়ে হিরাটে পাঠাই। আল্লার দয়ায় আমি হিন্দুস্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্রোহীদের এবং হিন্দুদের পর্য্যুদস্ত করে জয়ী হয়েছি। পরবর্ত্তী বসন্তকালে আল্লার ইচ্ছা

হলে আমি সশরীরে কাবুলে ফিরে যাব। এই ভাবেই আর একখানি চিঠি আমেদ আফসারকে লিখে পাঠাই। চিঠির এক কোণে আমি নিজের হাতে এই কথা কয়টি লিখে দিই যে—ফেরাদিন কাবুজিকে যেন আমার কাছে পাঠানো হয়। (কাবুজ-গিটারের মত বাদ্যযন্ত্র। ফেরাদিন—প্রসিদ্ধ কাবুজ-বাদক)।

সেই দিনই মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমি তরল পারদ সেবন করি। (তরল পারদ অনেকদিন থেকেই ভারতে কোষ্ঠবদ্ধতার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।)

২১শে তারিখ বুধবারে কামরাণ ও খাজা দোস্তখন্দের চিঠি নিয়ে একজন হিন্দুস্থানি পত্রবাহক আসে। খাজা দোস্তখন্দ জিলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখ কাবুলে পৌঁছে এবং হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে। (এই সময়ে হুমায়ুন বাদাকশানে জাফের দুর্গে এবং কামরাণ গজনিতে ছিল)। কামরাণ একজন লোককে খাজার কাছে পাঠিয়ে তাকে এই অনুরোধ জানায় যে—সে ঐখানেই থাকে, যাতে সে স্বয়ং গিয়ে সে যে সব আদেশ নিয়ে এসেছে তার মুখেই শুনতে পায়; তার অর্থ এই যে সমস্ত সংবাদ তাকে জানানোর পর তাকে তার গন্তব্য স্থলে যেতে দেওয়া হবে। জিলহজ্জ মাসের ১৭ই তারিখ কামরাণ কাবুলে পৌঁছায়। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করে ২৮শে তারিখ খাজা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাফের দুর্গে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

পত্রবাহক মারফৎ যে চিঠিগুলি পাই, তাতে এই আনন্দদায়ক সংবাদ ছিল যে পারস্যের রাজা তামাস্ উজবেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়ে দামঘানে রিনিস্ উজবেক (রিনিশ বাহাদুর খাঁ—ও বেদুল্লা খাঁয়ের নিযুক্ত আস্তারাবাদের শাসক) এবং তার সঙ্গীগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে নিহত করেছে। সেবানি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওবেদুল্লা খাঁ কিজলিবাসদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে হেরির অবরোধ তুলে নিয়ে মার্ভে ফিরে যায় ও সমরখন্দ সন্নিকটস্থ দেশগুলিকে তার সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে মাওরালনাহারের সুলতানগণ তাকে সাহায্য করার জন্য সেই নগরে যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে।

সেই পত্রবাহক আরও সংবাদ নিয়ে আসে যে, হুমায়ুনের ঔরসে ইয়াদগার তাঘাইয়ের কন্যা বেগা-বেগমের গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে, আর কামরাণ তার মাতুল সুলতান আলি মির্জ্জার কন্যাকে বিবাহ করেছে।

২৩শে তারিখ, শুক্রবার (৬ই নভেম্বর) আমি এমন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত

হই যে শুক্রবারের নমাজ পড়া মসজিদে শেষ করতে পারিনি। দুপুরের নমাজের সময় আমার লাইব্রেরীতে যাই, কিন্তু তখন এমন অসুস্থতা বোধ করি যে অতি কষ্টে আমার নমাজ শেষ করতে পারি।

দুইদিন পর রবিবার (৮ই নভেম্বর) আমার কম্পনসহ জ্বর হয়। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে আমি মনে মনে এই আলোচনা করি যে, মহামান্য খাজা ওবিদের পিতামাতার সম্মানে যে ছোট পুঁথি লেখা আছে তা আমি কবিতায় রূপান্তরিত করবো। মহামান্য খাজার আত্মার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আমি মনে মনে এই আশা লালন করেছিলাম যে, তিনি হয়তো আমার কবিতা ভালভাবে গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত করবেন যেমন তিনি কাসিদের লেখককে করেছিলেন। সেই লেখক তাঁর লেখা 'কাসিদে' তাঁকে উৎসর্গ করলে তিনি তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে সে পক্ষাঘাত রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমার এই প্রতিজ্ঞার ফলে আমি একটি কবিতা রচনা করি এবং সেই সন্ধ্যায় তেরোটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে ফেলি। প্রতিদিন এই রকম কিছু কিছু দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাব এবং তা কখনও দশটার কম হবেনা এই কথা মনে মনে সঙ্কল্প করি। আমি মাত্র একদিন কবিতা লিখতে পারি নি। গত বছর এবং প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব্বে যখনই আমি এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম তখন এই পীড়ার ভোগ একমাস কি চল্লিশদিন চলেছে। কিন্তু আল্লার দয়ায় ১২ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার আমার ব্যাধির প্রকোপ কমে আসে এবং তারপর রোগমুক্ত হই। প্রথম রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ (২১শে নভেম্বর) সেই পুঁথি কবিতায় রূপান্তরিত করা শেষ করি। আমি গড়ে প্রতিদিন বাহান্নটি দ্বি-পদী কবিতা লিখে যাই।

প্রথম রবিয়ল মাসের ৯ই তারিখ রবিবার বেগ মহম্মদ তালাকচি ফিরে এলো। তাকে গত বছর সম্মানসূচক পোষাক ও ঘোড়াসহ হুমায়ুনের কাছে পাঠাই।

এই মাসের ১০ই তারিখ, হুমায়ুনের নিকট থেকে ওয়াইস লাখারির পুত্র বেগ গিনা এবং বিয়ান সেখ নামে হুমায়ুনের একজন ভৃত্য এই শুভ সংবাদ নিয়ে আসে যে হুমায়ুনের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে এবং তার নাম রাখা হয়েছে আলি আমান।

বেগ গিনা রওনা হওয়ার অনেক পরে বিয়ান সেখ হুমায়ুনের কাছে থেকে রওনা হয়। সফর মাসের ৯ই তারিখ (২৩শে অক্টোবর) সে রওনা হয় এবং প্রথম

রবিয়াল মাসের ১০ই তারিখ আগ্রায় পৌঁছে যায়। সে খুব দ্রুত চলে আসে। আরএকবার সে কিলা-ই-জাফর থেকে কান্দাহারে ঠিক এগারো দিন পৌঁছে যায়।

বিয়ান সেখ সাহাজাদা তামাসের ইরাক থেকে সৈন্যচালনা এবং উজবেগদের পরাস্ত করার সংবাদ আনে। এইখানে তার বিবরণ দিচ্ছি। সাহাজাদা তামাস ইরাক থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রুমির রীতি অনুযায়ী কামান সজ্জিত করে দ্রুত অগ্রসর হন। তিনি বাস্তাম জয় করেন। রিণিশ উজবেগ ও তার দলবলকে দামঘান্সে নিহত করেন। তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান। কামবার-ই-আলি বেগ কিজিলবাসের অনুচরদের হাতে পরাস্ত হয়ে কিছু লোকজন নিয়ে উস্তাদ খাঁয়ের কাছে যায়। উস্তাদ খাঁ হেরির কাছাকাছি থাকা উচিত নয় মনে করে তাড়াতাড়ি ঘোড়-সোয়ার পাঠিয়ে বাল্‌খ, হিসার, সমরকন্দ এবং তাসখন্দের সুলতানদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে নিজে মার্ভে চলে যায়। তাসখন্দ থেকে বারাক সুলতানের ছোট ছেলে সিনজুক সুলতান, সমরকন্দ থেকে কুচুম খাঁ ও তাঁর পুত্রদ্বয় আবু সৈয়দ সুলতান এবং পুলাদ সুলতান, এবং পুত্রগণ সহ জানিবেগ সুলতান, হিসার থেকে মিয়াকাল, মাধি সুলতান এবং হামজা সুলতানের পুত্রগণ—বালখ্‌ থেকে কাটিন কারা সুলতান—সবাই অত্যন্ত দ্রুত মার্ভে এসে সমবেত হন।

তাঁদের কাছে সংবাদ সরবরাহকার'রা এই সংবাদ নিয়ে আসে যে—'উবেদ খাঁ হেরির কাছে অল্প কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে'—সাহাজাদা এই কথা শুনে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনতে পান যে সুলতানরা মার্ভে সমবেত হয়েছেন তখন তিনি রাদজানে পরিখা খনন করে সেখানেই অবস্থান করছেন। সংবাদবাহীদের কাছে এই কথা শুনে উজবেগরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতার কথা একেবারে গ্রাহ্য না করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—আমরা সুলতান ও খাঁরা মাসাদে অবস্থান করবো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে কিজিলবাসের কাছাকাছি এগিয়ে যাব এবং শত্রুপক্ষকে গর্ত থেকে মাথা তুলতে দেব না। যাদুকরদের এই আদেশ দেওয়া হবে যে তারা যেন বৃশ্চিক লগ্নে তাদের যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে। সেই সময়েই আমরা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে পারবো।' এই রকম কথাবার্তা হওয়ার পরই তারা মার্ভে থেকে বেরিয়ে আসে। সাহাজাদা মাসাদ থেকে এগিয়ে এসে জাম্‌ ও খিরগাদের কাছাকাছি জায়গায় উজবেগদের

মুখোমুখি হন। উজবেগ পক্ষ পরাজিত হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে বহু সুলতান নিহত হয়।

একটি চিঠিতে লেখা ছিল—"এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি যে কুচুম খাঁ ছাড়া আর কোনও সুলতান বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছে কিনা। এ পর্য্যন্ত এ পক্ষের একজন লোকও ফিরে আসেনি।" যে সব সুলতান হিসারে ছিল তারা সেখান থেকে সরে পড়ে। ইব্রাহিম জানির পুত্র চাতমা—যার প্রকৃত নাম ইসমাইল, সে নিশ্চয়ই এই দুর্গে আছে।

বিয়ান সেখকেই হুমায়ুন ও কামরাণের নামে চিঠি দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করি। এই চিঠি এবং আরও অনেকগুলি এই মাসের ১৪ই তারিখ, শুক্রবার (ইংরাজী ২৭শে নভেম্বর) শেষ করে তার হাতে ন্যস্ত করে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। সে ১৫ই তারিখ শনিবার আগ্রা ত্যাগ করে চলে যায়।

হুমায়ুনের নিকট লিখিত পত্রের নকল

যাকে আমি সুস্থ দেহে পুনর্ব্বার দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি—সেই হুমায়ুনের প্রতি—

প্রথম রবিয়ল মাসের ১লা তারিখ শনিবার (পূর্ব্বে উল্লেখিত হয়েছে রবিয়ল মাসের ১০ই তারিখ এবং ঐ তারিখই সঠিক) বিয়ান সেখ বেগ বিনাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে পৌঁচেছে এবং যে চিঠিপত্র সে নিয়ে এসেছে তাতেই ওদিককার সমস্ত খবরাখবর জানতে পারলাম। আল্লাকে ধন্যবাদ! তিনি তোমাকে একটি শিশুপুত্র দান করেছেন—যে শিশু আমার কাছে একটি আশ্বাসের বস্তু এবং পরম স্নেহের পাত্র। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এইরূপ আনন্দদায়ক বস্তু দান করে চরিতার্থ করুন—এই প্রার্থনা। হে দুই জগতের অধীশ্বর, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তুমি শিশুটির নাম রেখেছে—অল আমান। তুমি যে নাম রেখেছ আল্লার আশীর্ব্বাদ যেন তার ওপর থাকে। তুমি রাজতক্তে বসেছ। সুতরাং তোমার এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে জনসাধারণের অনেকেই এই কথাটা উচ্চারণ করে সাধারণতঃ অল-আমান (ঈশ্বর রক্ষিত) বলে, আবার কেউ কেউ উচ্চারণ করে—ইল-আমান (মনুষ্য রক্ষিত)। এ ছাড়া আরও কতকগুলি শব্দ আছে যার আগে 'অল' এই কথাটা যোগ করা হয়। তোমার এই শিশুপুত্রটি যেন তার নামে ও দৈহিক গঠনে সেই মহান সৃষ্টিকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ লাভ করে সুখী

ও ভাগ্যবান হয় এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের করুণা তোমার উপর এমন ভাবে বর্ষিত হয় যাতে অলআমানের সৌভাগ্যশালী এবং কৃতিত্বপূর্ণ জীবন অনেক বছর ধরে দেখে আমরা সুখী হতে পারি। অবশ্য, সেই সর্ব্বশক্তিমান তাঁর করুণা ও বদান্যতা দ্বারা এমন ভাবে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন যে তার তুলনা কোনও কালেই হয় না।

এই মাসের ১১ই তারিখ মঙ্গলবার আমার কাছে সংবাদ আসে যে বাল্‌খের জনসাধারণ কুরবানকে আমন্ত্রণ করে সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি তখনই পুত্র কামরাণকে এবং কাবুলের বেগদের এই আদেশ পাঠিয়েছি যে তারা যেন তোমার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে (হুমায়ুন তখন বাদাকসানে ছিলেন) যাতে তুমি অবস্থানুযায়ী এবং প্রয়োজন মত হিসার, সমরকন্দ অথবা মার্ভের দিকে অগ্রসর হতে পার। আমি এই আশা করছি যে ভগবানের দয়ায় তুমি শত্রুদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে ও তাদের দেশগুলি দখল করে নিয়ে তোমার বন্ধুদের আনন্দের এবং শত্রুদের প্রবল আতঙ্কের কারণ হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার এমন সময় এসেছে যখন দুঃখকষ্ট, বিপদের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করতে পারবে। যে অবস্থাই আসুক না প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের শক্তি কঠোরভাবে চালনা করতে ভুলো না। কারণ, আলস্য ও আরাম-প্রিয়তা রাজপুরুষদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

(ফারশিতে)—

"উচ্চাশা, আল:স্যরে কভু
দেয় না প্রশ্রয়।
এ জগৎ তারই, অবিরাম চেষ্টা
যাকে করেছে আশ্রয়।
জ্ঞানী জানে—
সবাই পারে করিতে আরাম
রাজার কাছে শুধু,
আরাম হারাম।"

যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শত্রুকে পরাস্ত করে বাল্‌খ ও হিসার দখল করতে পার, তাহলে তোমার লোক হিসারের ভার নেবে এবং কামরাণের লোক বাল্‌খে থাকবে। যদি সর্ব্বশক্তিমান আল্লার দয়ায় সমরকন্দ আমাদের হাতে আসে, তুমি তাহলে ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজে গ্রহণ করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে

আমি ঐ দেশে সাম্রাজ্য গড়ে তুলবো। যদি কামরাণ মনে করে যে বাল্খ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাহলে আমাকে জানিও। আমি আল্লার দয়ায় নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি থেকে কিছু যোগ করে দিয়ে তার আপত্তি দূর করবো। তুমি জান যে তুমি সব সময় ছয় ভাগ পাও এবং কামরাণ পায় পাঁচ ভাগ। তুমি সর্ব্বদাই এই নিয়ম মনে রেখো এবং সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলো। এ কথাও তুমি মনে রেখো যে সর্ব্বদা তুমি তার সঙ্গে মানিয়ে চলবে। যে বড় হয় তাকে মহানুভবও হতে হয়। আমি আশা করি যে তুমি তার সঙ্গে ভাল সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে। তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে বলা যায় যে সে একজন সৎ যুবক। তোমার প্রাপ্য সম্মান সে তোমাকে দেবে এবং তোমার অনুগত হয়ে থাকবে। এ কথা তাকে সব সময়ই মনে রেখে সতর্ক হয়ে চলতে হবে।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে। প্রায় দুই তিন বছর তোমার কাছ থেকে কোনও লোকই আমার কাছে আসেনি। পত্রবাহক-রূপে যে লোকটিকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম—সে বারো মাসের মধ্যেও আমার কাছে ফিরে আসেনি। মনে রেখো, এই রকম ব্যাপার অবাঞ্ছনীয়!

তুমি অনেক চিঠিতেই অনুযোগ জানিয়েছ যে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ। এ রকম অনুযোগ একজন রাজপুরুষের পক্ষে অন্যায়। কারণ, কথায় আছে—

(ফারশিতে) 'কাজের শৃঙ্খলে যদি বদ্ধ তুমি
সেই অবস্থার দাস হয়ে থাক।
মনে ভাব যদি তুমি নহে পরাধীন,
তবে চল নিজের খেয়াল মত।'

রাজার অবস্থার মত গুরুতর বন্দীদশা আর নাই। সুতরাং তার পক্ষে অপরিহার্য্য বন্ধু-বিচ্ছেদ নিয়ে অনুযোগ করা অনুচিত।

আমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি আমাকে চিঠি লিখে থাক, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি চিঠি লেখার পর একবার পড়েও দেখ না। যদি তা করতে তাহলে তোমার নিজের ভুলগুলি তুমি দেখতে পেতে ও সেগুলি শোধরাবার চেষ্টা করতে। তোমার শেষ চিঠির অর্থ উদ্ধার করতে এবং তার মানে বুঝতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। চিঠি এলোমেলো ভাবে লেখা ও দুর্বোধ্য। গদ্যে কে হেঁয়ালি দেখেছে? তোমার বানান মন্দ নয় কিন্তু একেবারে শুদ্ধও

নয়। তোমার চিঠি অবশ্য বোঝা যায় কিন্তু দুরূহ শব্দ ব্যবহারের জন্য কোনও মতেই সহজবোধ্য হয় না। চিঠি লেখায় তোমার উৎকর্ষতার অভাব আছে নিশ্চয়ই। তোমার বিফলতার প্রধান কারণ এই যে, তুমি নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো। ভবিষ্যতে কৃত্রিমতা বর্জন করে স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় চিঠি লিখবে। তাতে লেখক ও পাঠক দুয়েরই কষ্ট লাঘব হবে।

তুমি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাত্রা করছো। সেইজন্য সর্ব্বদাই এখন যে সব জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, মহান ব্যক্তিরা তোমার কাছে আছেন, তাঁদের উপদেশ নিয়ে সেই ভাবে নিজেকে চালিত করবে।

যদি তুমি আমার প্রশংসা অর্জন করতে চাও, তাহলে তুমি বাজে লোকের সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট করো না, বরং সেই সময়টা যারা তোমার শুভানুধ্যায়ী তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনায় ও মেলামেশায় কাটিও। প্রত্যেকদিন দুইবার তোমার ভাই এবং বেগদের তোমার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিও, তাদের মরজিমত তোমার কাছে হাজির হওয়ার সুযোগ দিও না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার পর যে কোনও ব্যাপারেই হোক তুমি যেটা সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করবে সেই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত করবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে খাজা কালানের সঙ্গে তুমি বিশেষ বিশ্বস্ত আচরণ করবে। তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে আমাকে যেমন কাজ করতে দেখেছো সেই ভাবে তুমিও কাজ করে যাবে। আল্লার দয়ায় তোমার চার পাশের দেশগুলি নিয়ে কাজের পীড়াদায়ক দুরুহতা যখন কমে আসবে, তখন আর কামরাণকে তোমার প্রয়োজন হবে না। সে রকম অবস্থা এলে তোমার ভাই বাল্খে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের রেখে আমার কাছে চলে আসতে পারবে।

যখন কাবুলে ছিলাম তখন অনেক বড় বড় কাজ করেছি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভও আমার হয়েছে। সেই জন্য ঐ স্থানটিকে আমার সৌভাগ্যের দ্যোতক মনে করে আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে নিরুপণ করেছি। তোমরা কেউ যেন এই দেশটি নিজের দখলে রাখবার জন্য মতলব করো না।

সুলতান উইসের হৃদয় জয় করবার জন্য তুমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ ভদ্রব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তিনি জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁকে তোমার কাছে কাছে রাখবে ও তাঁর উপদেশ মত কাজ করবে।

সৈন্যদলের শৃঙ্খলা ও তাদের কার্য্যক্ষমতা যাতে সব সময় বজায় থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

বিয়ান সেখ সব বিষয়ই আমার কাছে থেকে জেনে গেল। তোমার যদি কিছু জানবার থাকে তার কাছ থেকে মৌখিক জেনে নিতে পারবে।

আমি আবার তোমার সুস্বাস্থ্য আন্তরিক ভাবে কামনা করছি।

(প্রথম রবি মাসের ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার লিখিত)।

এই ভাবেই কামরাণ ও খাজা কালানকে আমি নিজের হাতে চিঠি লিখি।

১৯শে তারিখ বুধবার আমি মির্জ্জা ও সুলতানদের, তুর্কি ও হিন্দুস্থান বেগদের ডেকে পাঠাই। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, আমি এই বৎসর কোনও না কোনও দিকে সৈন্য চালনা করবে। আমার যাত্রার পূর্ব্বে আসকারি (বাবরের একজন পুত্র) পূর্ব্বপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে এবং গঙ্গার ওপারের আমির ও সুলতানরা তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর আমি যেরূপ ভাবে অভিযান আরম্ভ করা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবো সেইভাবেই অভিযান সুরু হবে। আমার এই সমস্ত অভিপ্রায় লিখিতভাবে জানিয়ে ২৯শে তারিখ শনিবার গিয়াসউদ্দিন কাচিকে সুলতান জানিদ বিরলাস ও পূর্ব্বপ্রদেশের আমিরদের কাছে পাঠাই ও নির্দ্দেশ দিই যেন তারা একুশদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি গিয়াসউদ্দিন কাচিকে মৌখিক উপদেশ দিই যেন সে তাদের জানিয়ে দেয় যে আমি আসকারির নিকট অস্ত্রশস্ত্র, কামান এবং যুদ্ধবিশারদ সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠাবো এবং সেগুলি যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগেই ঠিক করা হয়ে যাবে। গঙ্গার অপর পারের সমস্ত আমির ও সুলতানদের আসকারির সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আল্লার অনুগ্রহে যেদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে হবে সেই দিকেই অভিযান করার আদেশ দেওয়া হলো। তাদের আরও জানিয়ে দেওয়া হলো যে ঐ দিকে আমার পক্ষভুক্ত যে সব লোক আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে যে ঐ দিকে এমন কিছু কাজ আছে কিনা—যার জন্য আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। যদি সত্যই প্রয়োজন থাকে তাহলে আমার যে কর্ম্মচারীকে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আমার সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে পাঠানো হয়েছে সে ফিরে এলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে কালবিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেব। তবে বাঙ্গালীরা যদি শান্ত থাকে ও বিদ্রোহের মনোভাব

না দেখায় আর যদি সেদিকে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় যাতে আমার উপস্থিতির নিতান্ত প্রয়োজন হতে পারে তা হলে সে কথা আমাকে যেন তারা জানিয়ে দেয়। তাহলে আমি এখানেই অপেক্ষা করবো এবং আমার সৈন্যদের অন্য কোনও দিকে চালনা করবো। আমার অনুরাগী ও বন্ধুরা আসকারির সঙ্গে যেন অবশ্য অবশ্য পরামর্শ করেন এবং দৈব আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ঐ দিকে কি ধরণের কাজ সাধারণ ভাবে অনুসরণ করা উচিত তা যেন ঠিক করেন।

প্রথম রবিয়ল মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার আস্কারিকে মূল্যবান পাথরখচিত ছোরা, কটি-বন্ধন, সম্মানসূচক রাজকীয় পোষাক, একটি পতাকা, ঘোড়ার লেজ, দামামা, তিপচাক্ জাতীয় অশ্ব, দশটি হাতী, কয়েকটি উট ও খচ্চর, রাজজনোচিত সাজ সরঞ্জামসহ তাঁবুর আসবাবপত্র উপহার দিকে তাকে দরবার সভায় সকলের প্রথমে বসার অনুমতি দিই। মোল্ল দাদা আংকেকে এক জোড়া মূল্যবান বোতাম খচিত পাদুকা এবং তাঁর অন্যান্য কর্ম্মচারীকে তিন × নয় (সাতাশটি) ফতুয়া দান করি। (মোগল ও তুর্কিদের নিয়মানুসারে ৩ × ৯ সংখ্যক দ্রব্য উপহার দেওয়া সৌভাগ্যসূচক)।

এই মাসের শেষ দিন রবিবার সুলতান মহম্মদ বকশিসের বাড়ী যাই। তার বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা মূল্যবান গালিচায় ঢাকা ছিল। সে আমাকে উপঢৌকন দেওয়ার আয়োজন করে। জিনিষপত্রে ও অর্থে যে পেশকোশ সে আমাকে প্রদান করে তার মূল্য দুই লাখের ও বেশী। আহার এবং উপঢৌকন নেওয়া শেষ করে আমরা অন্য কক্ষে যাই এবং সেখানে সিদ্ধির সরবৎ পান করি। বেলা তিন প্রহরের সময় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে আমার নিজের প্রসাদকক্ষে চলে আসি।

শেষ রবিয়ল মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার চিকমাক বেগকে আগ্রা থেকে কাবুলের দূরত্ব মাপ করবার জন্য শীলমোহর যুক্ত রাজ আদেশ জারি করি। সেই আদেশে বলা হয় যে প্রতি নয় ক্রোশে একটি করে ছোট গম্বুজ তৈরী করতে হবে, তার মাপ হবে উচ্চতায় বার গজ এবং শীর্ষে থাকবে চন্দ্রাতপ। প্রতি দশ ক্রোশে থাকবে ছয়টি ঘোড়ার ডাকচৌকি। ডাকচৌকির তদারককারি, পত্রবাহক, ঘোড়ার সহিস এবং রসদের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকবে। আরও আদেশ দেওয়া হয় যে, যদি ডাকচৌকির কাছে সরকারী খাস জমি থাকে তাহলে তারই আয় থেকে বরাদ্দ মাফিক অর্থ জোগান দিতে হবে। যদি

এই ডাকচৌকি কোনও পরগণার মধ্যে হয় তাহলে সেই পরগণার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বরাদ্দ অর্থ সরবরাহ করতে হবে। সেইদিনই চিকমার পাদশাহি আগ্রা ত্যাগ করে। ক্রোশের মাপ কি ভাবে ঠিক করা হয় নীচের কবিতায় তা উল্লেখ করা হলো।

(তুর্কিতে) এক ক্রোশ হয় চার হাজার পদক্ষেপে।
প্রতি পদক্ষেপ জেনে রাখ, দেড় হাত মাপে।
প্রতি হাত হয় ছয় মুষ্টি পরিমাণ।
প্রতি মুষ্টি হয় ছয় ইঞ্চির সমান।
প্রতি ইঞ্চি ছ'টি যবের পরিসর।
এই মাপের কথা জেনে হও তৎপর

একটি মাপের ফিতায় চল্লিশটি পদক্ষেপের পরিমাপের নির্দেশ থাকে। প্রতি পদক্ষেপের মাপ দেড় হাতের সমান, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক পদক্ষেপ নয় মুষ্টি পরিসরের সমান। এই মাপের ফিতায় একশ'বার মেপে গেলে এক ক্রোশ হয়।

৬ই তারিখ শনিবার উদ্যানে আমি ভোজের ব্যবস্থা করি। উদ্যানের উত্তরের দিকে একটি আটকোণা পটমণ্ডপে বসবার স্থান হয়। এই মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ম্মাণ করা হয় এবং উপরটা শীতলতার জন্য খসখস ঘাসে ঢাকা হয়। আমার দক্ষিণ দিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বুধা সুলতান, আসকারি ও খাজা হুসেনি খলিফা, সমরকন্দ থেকে আগত লোকেরা, খাজার অধীনস্থ লোকজন, কোরাণ পাঠক ও মোল্লারা আসন গ্রহণ করেন। আমার বাঁদিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বসেন— মহম্মদ জেমান মির্জ্জা, আতেকে ইৎসিম সুলতান, সৈয়দ রফি, সৈয়দ রুমি, সেখ আবুল ফতে, সেখ জামালি, সেখ সাহাবুদ্দিন আরব এবং সৈয়দ দাকনি। এই ভোজোৎসবে কিজিলবাস, উজবেক এবং হিন্দু দূতরাও উপস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ৭০।৮০ গজ দূরে একটি চাঁদোয়া খাটানো হয় যেখানে কিজিলবাসের দূতদের স্থান দেওয়া হয় এবং আমিরদের মধ্যে ইউনিস আলিকে তাদের পাশে বসবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ঐ একইভাবে বামদিকে উজবেক দূতদের জন্য বসবার স্থান ঠিক করা হয় এবং আমিরদের মধ্যে আবদাল্লাকে তাদের কাছে বসার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। আহার্য্য পরিবেশন করার আগে সমস্ত খাঁ, সুলতান, উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক এবং আমিররা আমাকে লাল, সাদা এবং কালো

রংয়ের মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা), বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন দেন। আমার সম্মুখে একটি পশমি গালিচা পেতে দেওয়ার নির্দেশ দিই। তার উপর স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা বর্ষণ হয়। রঙ্গিণ ও সাদা কাপড়ের উপহার, থলিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পাশে রাখা হয়। আহারের পূর্ব্বে যখন উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপার চলছে তখন সামনের দিকে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে উট ও হাতীর ভয়ঙ্কর লড়াই দেখানো হয়। ভেড়ার লড়াই এবং পরে পালওয়ানদের মল্লযুদ্ধও চলতে থাকে। যখন আহার্য্য পরিবেশন করা হয় সেই সময় খাজা আবদুল সহিদ, খাজা কালানকে মিহি তুলার সুতায় তৈরী মসলিনের এবং সম্মানসূচক আরও পোষাক উপহার দেওয়া হয়। মোল্লা ফারুক, হাফিজ এবং আরও তিনজন কাপড়ের ঢিলা গাত্রাবরণ পায়। কুচিন খাঁয়ের দূত ও হাসান চালেবির ছোট ভাইকে বহুমূল্য বোতামযুক্ত মসলিনের পরিচ্ছদ এবং নিজ নিজ পদমর্যাদানুযায়ী অন্যান্য পোষাক দেওয়া হয়। আবু সৈয়দ সুলতান এবং মেহেরবান খাতুনের দূতগণ ও মেহেরবান খাতুনের পুত্র পুলহাদ খানকে এবং সা হাসানের দূতগণকে বোতামযুক্ত কোর্তা ও মূল্যবান কাপড়ের পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। একটি সোনার তালকে রূপোর মাপ দিয়ে এবং একটি রূপোর তালকে সোনার ওজনের মাপ দিয়ে ওজন করা হয়। সেই সোনা ও রূপো দোস্ত খাজা ও কোচিন খাঁর দুই মহান দূত এবং হসেন খাঁ চালেবির ছোট ভাইকে দেওয়া হয়। সোনার তাল ওজনে ছিল পাঁচশ মিসকাল যা কাবুলের প্রচলিত ওজনে এক সের এবং রূপোর তাল ওজনে ছিল 'আড়াইশ' মিশকাল—যা কাবুলের ওজনের আধসের। খাজা মির সুলতানি, তাঁর পুত্রগণ, হাফিজ তাসকেন্দি, মোল্লা ফারুক এবং তাঁর অনুগতগণ, খাজার ভৃত্যগণ ও অন্যান্য দূতরা প্রত্যেকেই সোনা ও রূপার উপহার পায়। মির মহম্মদ জাহেলবান গঙ্গার উপর সেতু তৈরী করার সময় অদ্ভূত নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ভাল পুরস্কারলাভের যোগ্যতা লাভ করে। সে ও অন্যান্য বন্দুকধারী সৈনিক পালওয়ান হাজি মহম্মদ, পালওয়ান বাবুল ও ওয়ালি পারশ্চি প্রত্যেককে ছোরা উপহার দেওয়া হয়। সৈয়দ দাউদ গারমসিরি সোনা ও রূপার উপহার পায়। আমার কন্যা মাসুমার ও পুত্র হিন্দালের ভৃত্যগণ বোতাম-যুক্ত ফতুয়া এবং মূল্যবান কাপড়ের সম্মানসূচক পোষাক পায়। অন্দেজানের যে সব লোক দেশ ছাড়া গৃহ ছাড়া হয়ে আমার সঙ্গে যাযাবর জীবন যাপন করে সুখ, হোসিয়ার ও আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে আমার সেই সব বিশ্বস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান সূচক পরিচ্ছদ, ফতুয়া, সোনা, রূপা এবং আরও অনেক

মূল্যবান দ্রব্য দান করি। কুরবান, সেখির ও কামার্দের অধিবাসীদের অনুরূপ ভাবে উপহার দেওয়া হয়।

আহার্য্য পরিবেশন করার সময় হিন্দুস্থানি ভোজবাজিকরদের আনা হয়। তারা তাদের কৌশলপূর্ণ ভোজবাজি দেখায়। যারা ডিগবাজি খেলা দেখায় এবং দড়ির উপর নৃত্য কৌশল দেখায়, তারাও তাদের খেলা দেখাতে থাকে। হিন্দুস্থানী ভেল্কিবাজিকররা এমন কতকগুলি খেলা দেখায় যা আমাদের দেশে কখনও দেখিনি। সেই খেলার একটি এইরূপ:— তারা সাতটি আংটি নিয়ে একটা রাখে কপালের ওপর, দুইটি দুই জানুর ওপর, অবশিষ্ট চারটির দুইটি রাখে দুইটি হাতের আঙ্গুলের ওপর এবং আর দুইটি রাখে পায়ের আঙ্গুলের ওপর। এই সব আংটি তারা একসঙ্গে অবিরাম দ্রুত ঘোরাতে থাকে। আর একটি খেলা এইরূপ:—তারা মাটির ওপর একটা হাত রেখে আর একটা হাত এবং দুই পা উঁচুতে তোলে। এই উত্তোলিত হাত ও পা এমন ভাবে বিস্তার করে যে দেখে মনে হয় যেন পেখম-মেলা ময়ূর। এই অবস্থাতেই তারা হাত ও দুইটি-পায়ের ওপর তিনটি আংটি রেখে অনবরত ঘুর পাক খেতে থাকে।

আমাদের দেশে যারা ডিগবাজির খেলা দেখায় তারা দুইটি কাষ্ঠদণ্ড পায়ে বেঁধে সেই দণ্ডের ওপর ভরদিয়ে হেঁটে বেড়ায়। আর হিন্দুস্থানী ডিগবাজিকররা একটি মাত্র কাষ্ঠদণ্ডকে আশ্রয় করে তাতে পা না বেঁধে হাঁটার কসরত দেখায়। আমাদের দেশে দুইজন ডিগবাজিওয়ালা পরস্পর জড়াজড়ি করে ডিগবাজি খেলা দেখায়। এখানকার হিন্দুস্থানি ডিগবাজিকররা তিন চারজন পরস্পরকে ধরে থাকে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে বৃত্তের আকারে ডিগবাজির কসরত দেখাতে থাকে। একটি বিশেষ খেলা এরা দেখিয়ে থাকে সেটি এই। একজন একটি ছয় সাত গজ মাপের বাঁশের নীচের দিকটা তার দেহের মাঝখানে খাড়া করে ধরে থাকে, আর অন্য একজন সেই বাঁশ বেয়ে উঠে বাঁশের ওপর খেলা দেখাতে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একজন ছোকরা ডিগবাজিওয়ালা এক বয়স্ক ডিগবাজিকরের মাথার ওপর চড়ে বসে। নীচের লোকটি এ পাশ ও-পাশ নানা কসরত দেখাতে দেখাতে দ্রুত হেঁটে চলে সেই ছোকরাকে মাথায় করে, আর সেই ছোকরাটিও মাথার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নানা খেলা দেখাতে থাকে। নর্ত্তকীরা এই সময় তাদের নাচ দেখায়। সান্ধ্য নমাজের সময় অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ছড়ানো হয়। এই সময় অনেক লোক জমায়েৎ হয়।

খুব হৈ চৈ হতে থাকে। সান্ধ্য ও রাত্রির নমাজের মাঝামাঝি সময়ে আমার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমার নিকট বসাই। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। পরদিন দুপুরের আগে আমি নৌকায় চড়ে হাস্ত-বেহেস্তে যাই।

সোমবার (২১শে ডিসেম্বর) আস্‌কারি এই সহর ত্যাগ করে পূর্ব্বদিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। সে যাওয়ার আগে স্নানাগারে আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

ঢোলপুরে পুকুর, বাগান ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যে আদেশ দিয়েছিলাম সেগুলো দেখার জন্য মঙ্গলবার (২২শে ডিসেম্বর) যাত্রা করি। আমার উদ্যান-প্রাসাদ থেকে সকালে দুই প্রহর এক ঘড়ির সময় (সকাল সাড়ে নয়টা) আমি অশ্বারোহণ করি এবং রাতের প্রথম প্রহরের পাঁচ ঘড়ির সময়ের (রাত আটটা) পর ঢোলপুর উদ্যানে পৌঁছাই।

বৃহস্পতিবার ইঁদারা, ছাবিবশটি নর্দ্দামা, স্তম্ভ ও জলনিকাশী নালা তৈরীর কাজ শেষ হয়। এগুলি কঠিন পাথর কেটে কেটে করা হয়েছে। সেইদিন তৃতীয় প্রহরের সময় (দুপুর থেকে বেলা তিনটার মধ্যে) ইঁদারা থেকে জল তোলার কাজ আরম্ভ হয়। পাথর খোদাইকার মিস্ত্রি এবং অন্যান্য মজুরদের আগ্রার কারিগর ও মজুরদের প্রাপ্য মজুরির হিসাব অনুসারে বকসিস দেওয়া হয়। ইঁদারার জলে যাতে খারাপ স্বাদ না থাকে সেই জন্য চাকা ঘুরিয়ে ইঁদারা থেকে পনরো দিন দিনরাত অনবরত জল তুলে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়।

শুক্রবার সকালে প্রথম প্রহরের এক ঘড়ি সময়ে (পৌনে নয়টা) ঢোলপুর থেকে যাত্রা করি এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঘোড়া থেকে নেমে নদী পার হয়ে আসি।

গিয়াসউদ্দিন কারচিকে জৌনপুর পাঠিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসার আদেশ দিয়েছিলাম। সে ১৬ দিন অনুপস্থিত থাকার পর আজ (২৭শে ডিসেম্বর) ফিরে এলো। সুলতান জুনিদ ও তার কর্ম্মচারীরা সেই সময় সৈন্য-সংগ্রহ করে থাণ্ডিদের (উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার এক মহকুমা) দিকে অগ্রসর হয়। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়াসউদ্দিনকেও সেই দিকে যেতে হয়, যার ফলে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারেনি। সুলতান জুনিদ মৌখিক জানায় যে, ভগবানের অসীম দয়ায় ওদিককার ব্যাপার এমন স্বাভাবিক যাতে স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। একজন মির্জ্জা (সম্রাটপুত্র আসকারি) এলে এ দিককার সুলতান, খাঁ ও আমিরদের আহ্বান

করলেই তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তার বিশ্বাস সবই সন্তোষজনক ভাবে চলবে, সব ব্যবস্থাই ঠিক মত হয়ে যাবে। আমি এই রকম উত্তর সুলতান জুনিদের কাছ থেকে পেলেও মোল্লা মহম্মদ মজহাবের—যাকে বিধর্মী সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধের পর বঙ্গদেশে রাজদূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং যার ফিরে আসার প্রতি দিনই আশা করছি—কাছ থেকে বিশদ বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

১৫২৯ সালের ঘটনাবলী

শুক্রবার (১লা জানুয়ারি) আমি সিদ্ধির সরবৎ খাই। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে যখন আমার গোপন কক্ষে বসেছিলাম সেই সময় মোল্লা মহম্মদ মজহার এসে পৌঁছায়। সন্ধ্যা'য় সে আমার কাছে এসে সেলাম দেয়। আমি একের পর এক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐ দিকের ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জানতে পারি যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ বশে আছে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করছে।

শনিবার আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আমার গোপন কক্ষে আহ্বান করি। তাদের সাথে আলোচনা করে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙ্গালীরা যখন দূত পাঠিয়েছে এবং বশ্যতা স্বীকার করে শান্ত হয়ে আছে তখন আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই. আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার দরকার না হলে ওদিকে এমন কোনও প্রয়োজন নাই যেখানে গেলে সৈন্যরা আনন্দলাভ করতে পারে। বরং পশ্চিম দিকে এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলি নিকটেও বটে, সমৃদ্ধিশালীও বটে।

(তুর্কিতে) 'দেশটা সম্পদশালী'
অধিবাসীও বিধর্মী।
রাস্তাও বেশী নয়।
পূব দেশ অনেক দূরে,
এ দেশটা তো হাতের কাছে।'

অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমি পশ্চিম দিকে অভিযান করবো—কারণ এই দিকটাই নিকট। অভিযান সুরু করতে আমি কয়েক দিন বিলম্ব করি। পূব দিকের ব্যাপারটায় একটা নিশ্চিন্ততার ভাব মনে না জাগা পর্য্যন্ত অভিযানে বের হতে দ্বিধা করছিলাম। এইজন্য গিয়াস উদ্দিন কারচিকে আর একবার ঐ দিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠাই যে, সে যেন দিন কুড়ির মধ্যে সমস্ত সংবাদ জেনে ফিরে আসে। তার হাতে পূব দিকের আমিরদের নিকট

আমার হাতে লেখা ফর্মান পাঠিয়ে দিই। তাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে ওদিকে গঙ্গার অপর পারের সমস্ত সুলতান, খাঁ এবং আমিররা যেন আসকারির সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়। আমি গিয়াসুদ্দিনকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিই যে ফর্মান বিলি করার পর সে যেন নিজে ঐদিককার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি ধার্য্য সময়ের মধ্যে আমার কাছে ফিরে আসে।

এই সময় মহম্মদ গোকুলতাসের কাছ থেকে এই সংবাদ আমার কাছে পৌছায় যে বেলুচিরা আবার বিদ্রোহ করেছে এবং নানা স্থানে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিন তাইমুর সুলতানকে এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন সিরহিন্দ, সামান ও আর আর নিকটস্থ জায়গার আমিরদের—যেমন আদিল সুলতান, সুলতান মহম্মদ দুলদাই, খসরু গোকুলতাস, মহম্মদ আলি জং জং, দিলওয়ার খাঁ, আহম্মদ ইউসুফ, সা মনসুর বিরলাস, আব্দুল আজিজ, মির আখুর, সৈয়দ আলি, ওয়ালি কিজিলবাস, কিরাচে হালাহিল, আসিথ বেকাওয়েস, সেখ আলি কিত্তে, গজর খাঁ এবং হাসান আলি সিওয়াদি—সমবেত করে। তারা ছয়মাসের জন্য তাদের সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চিন্ তাইমুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেলুচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে এই নির্দ্দেশ দিই। আরও আদেশ দিই যে তারা যেন চিন তাইমুরের নির্দ্দেশমত একত্রে সমবেত হয় এবং তার আদেশ মেনে নিয়ে কাজ করে। আমার এই সব আদেশ জারি করার জন্য আবদুল গোফুরকে বিশেষ পত্রবাহক নিযুক্ত করি। ঠিক হয় যে আমার ফর্মান নিয়ে প্রথমে সে চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে যাবে পরে যে সব আমিরদের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কাছে আমার ফর্মানও পৌছে দিয়ে তাদের সসৈন্যে তাইমুর সুলতানের নির্দ্দেশ মত স্থানে সমবেত করার ব্যবস্থা করবে। আবদুল গোফুরকে আদেশ দেওয়া হয় যে, সে নিজে সৈন্যদলের সঙ্গে থাকবে এবং মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাবে যে কোনও লোক আলস্য ও নিরুৎসাহভাব দেখাচ্ছে কিনা। যদি তা দেখায় তাহলে সেই দোষী ব্যক্তিকে তার পদবী কেড়ে নিয়ে কর্ম্মচ্যুত করা হবে এবং তাকে শাসনভার থেকে মুক্ত করে পরগণা থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এই সব আদেশপত্র লিখে আব্দুল গোফুরের হাতে দিয়ে এবং মৌখিক আরও উপদেশ দিয়ে তাকে রওনা করে দিই।

রবিবার সকালে (১০ই জানুয়ারী) যমুনা পার হয়ে ঢোলপুরের বাগ-ই

নিলফুরে (কমল উদ্যানে) তৃতীয় প্রহরের শেষাশেষি সময়ে আসি। এই উদ্যানের কাছাকাছি কয়েকজন আমির ও সভাসদ নিজ নিজ ব্যয়ে প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করবে বলে কয়েকখণ্ড জমি নির্ব্বাচন করা হয়। প্রথম জুমাদা মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবার (১৪ই জানুয়ারী) স্নানাগার নির্ম্মাণের জন্য উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটি স্থান ঠিক করি। এই উদ্দেশ্যে সেই স্থানটি পরিষ্কার করা হয়। নির্দ্দেশ দিই যে ঐ জায়গায় উঁচু ভিত্তির ওপর ভাল মাল-মশলা দিয়ে স্নানাগার ও স্নানাগারের একটি কক্ষে কুড়ি বর্গফুট পরিমাপে একটি জলাধার নির্ম্মাণ করতে হবে।

সেই দিনই আমি আগ্রা থেকে খালিবে প্রেরিত কাজি জিয়া ও নর সিং দেওয়ের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি যে ইসকান্দারের পুত্র মহম্মদ বেহার অধিকার করেছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সসৈন্যে অভিযানে বের হওয়ার সঙ্কল্প করি। পরদিন শুক্রবার সকালে ছয় ঘড়ি বেলার সময় (প্রায় সকাল সাড়ে আটটা) অশ্বারোহণে নিলফুর উদ্যান ত্যাগ করে সান্ধ্য নমাজের সময় আগ্রায় পৌঁছাই। পথে মহম্মদ জেমান মিরজার সঙ্গে দেখা হয়। সে ঢোলপুরের দিকে আসছিল। চিন তাইমুর সুলতানও সেই দিনই আগ্রায় পৌঁছায়।

পরদিন শনিবার সকালে আমি আমিরদের পরামর্শ সভায় যোগ দিতে ডেকে পাঠাই। আলোচনা করে ঠিক হয় যে প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ (২১শে জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার আমরা পূর্ব দিকে রওনা হবো। সেই শনিবারেই কাবুল থেকে যে চিঠি আসে তা থেকে জানতে পারি যে —হুমায়ুন ঐ দিকের প্রদেশগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতান উইস্‌কে সঙ্গে নিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ সমরকন্দের দিকে অভিযানে বের হয়ে গেছে। সুলতান উইসের ছোট ভাই সা কুলি এগিয়ে গিয়ে হিসারে প্রবেশ করছে। তারমেজ থেকে বেরিয়ে তারমুন মহম্মদ সুলতান কারাদিয়ান অধিকার করেছে এবং আরও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। হুমায়ুন কিছু সৈন্য এবং একদল মোগলকে সঙ্গে দিয়ে তুলিক গোকুলতাস ও মির খুর্দকে তার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছে এবং নিজেও তাদের পিছু পিছু গিয়েছে।

প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল তিন ঘড়ির পর (সকাল প্রায় সওয়া সাতটা) পূব দেশের দিকে যাত্রা করি। নৌকায় যমুনা নদী পার হয়ে জলেশিরের কিছু উজানে বাগ-ই জারেফসানে (স্বর্ণবর্ষী উদ্যানে)

আসি। আদেশ দিই যে ঘোড়ার লেজের পতাকা, দামমা, অশ্ব এবং সমস্ত সৈন্য উদ্যানের বিপরীত দিকে নদীর অপর পারে থাকবে। যদি কেউ সম্রাটকে কুর্ণিশ করার জন্য আসতে চায় তাহলেও সে নৌকায় নদী পার হয়ে আসবে।

শনিবারে বঙ্গদেশের রাজদূত ইসমালি মিতা নজরানা নিয়ে আসে ও হিন্দুস্থানের রীতিঅনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করে। অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হলে যতদূর যায় ততদূরে সে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবার পরে সরে যায়। তারপর তাকে রীতি অনুযায়ী সম্মান সূচক পোষাক দেওয়ার পর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের রীতি অনুযায়ী তিনবার নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করার পর সে এগিয়ে এসে নসরত সার চিঠি আমাকে দেয়। তারপর যে সব উপঢৌকন সে নিয়ে এসেছিল সে সব দেওয়ার পর বিদায় গ্রহণ করে।

সোমবার (২৫শে জানুয়ারি) খাজা আবদুল হক পৌঁছানোর পর আমি নৌকায় নদী পার হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি।

মঙ্গলবার (২৬শে জানুয়ারি) হাসান চালেবি আমাকে অভিবাদন জানাতে আসে।

সৈন্য সজ্জার জন্য কয়েকদিন চারবাগে অবস্থান করি।

প্রথম জুমাদা মাসের ১৭ই তারিখ বৃহস্পতিবার (২৮শে জানুয়ারি) সকাল তিনঘড়ির সময় (সওয়া সাতটা) আবার সসৈন্যে যাত্রা সুরু করি। একটি নৌকায় চড়ে আগ্রা থেকে সাত ক্রোশ দূর আনওয়ার গ্রামে পৌঁছে তীরে অবতরণ করি।

রবিবার (৩১শে জানুয়ারি) উজবেক দূতদের বিদায় কালীন দর্শন দি। কুচিম খাঁর দূত আমিন মির্জাকে একটি ছোরা, একটি জমকালো ছুরিসহ কোমরবন্ধ, এবং সত্তর হাজার ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা উপহার স্বরূপ দিই। আবু সৈয়দ সুলতানের কর্মচারী মোল্লা তাঘাইকে এবং মেহেরবান খানুমের ও তার পুত্র পুলাদ সুলতানের ভৃত্যদের তাদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী অর্থ ছাড়াও বোতাম যুক্ত কোর্তা ও মূল্যবান কাপড়ে তৈরী সম্মানসূচক পোষাক দান করি।

পরদিন (১লা ফেব্রুয়ারি) খাজা আবদুল হক বিদায় নিয়ে আগ্রাতে বাস করার জন্য রওনা হন। খাজা ইয়া জিয়ার নাতি খাজা কালান যিনি উজবেকের সুলতান ও খাঁদের দূতের সঙ্গে এসেছিলেন, সমরকন্দে ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে বিদায়কালীন দেখা করেন।

হুমায়ুনের পুত্রসন্তান-জন্ম ও কামরাণের বিবাহ এই দুই শুভ ব্যাপারে আমার আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ মির্জ্জা তাব্রিজি ও মির্জ্জা বাগ তাঘাইকে এই দুইজন সম্রাটপুত্রের কাছে দশ হাজার সাক্রখি উপহার দিয়ে পাঠাই। তারা একটি করে পোষাক ও কোমরবন্ধও নিয়ে যায়, যা আমি নিজে ব্যবহার করতাম। হিন্দলের জন্য মোল্লা বেহিস্তের হাতে একটি মিনা করা ছোরা ও কোমরবন্ধ, একটি রত্নখচিত দোয়াত-দানি, ঝিনুক বসানো কাঠাসন, কোমরবন্ধসহ ঢিলে জামা এবং বাবর লিপির একটি বর্ণমালা পাঠাই। মির্জ্জা বেগ তাঘাইয়ের হাত দিয়ে কামরাণের কাছে হিন্দুস্থানে আসার পর আমি যেসব কবিতার অনুবাদ করেছি ও যে সব মূল কবিতা নিজে লিখেছি তার নকল এবং বাবর লিপিতে লেখা চিঠি পাঠাই।

মঙ্গলবার (২রা ফেব্রুয়ারী) আমার লেখা চিঠিগুলি যারা কাবুলে যাচ্ছে তাদের হাতে দিয়ে বিদায় জানাই। মোল্লা কাসিম, পাথরখোদাইকার ওস্তাদ সা মহম্মদ, মিরেক মির ঘিয়াস, পাথরখোদাইকার মির, সা বাবা বেলদারের (ইঁদারা ও পুকুর খননকারক) সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আগ্রায় ও ঢোলপুরে যে সব অট্টালিকা নির্ম্মাণ শেষ করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার মনের অভিলাষ কি তাদের বুঝিয়ে দিলাম এবং এই সব কাজের ভার তাদের উপর অর্পণ করে তাদের বিদায় দিলাম। প্রথম প্রহরের শেষে (সকাল প্রায় নয়টা) আনোয়ার ত্যাগ করার জন্য অশ্বরোহণ করি ও দুপুরের নমাজের পর চাঁদওয়ারের এক ক্রোশের মধ্যে আবাপুর গ্রামে এসে থামি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) আবদল মালুক কেরেচিকে বিদায় দিই। পারস্যের রাজার দূত হিসাবে হাসান চালেবির সঙ্গী হয়ে তাকে যেতে হবে। চাপুককেও সেইদিন বিদায় দিই। সে উজবেক দূতদের সঙ্গে খাঁ ও সুলতানদের নিকট দৌত্যকার্য্যে যায়।

রাতের চারঘড়ি তখনও অতিবাহিত হয়নি (শেষ রাত্রি ৪ টা) সেই সময় আবাপুর থেকে যাত্রা করি। প্রত্যূষে চান্দওয়ার অতিক্রম করে নৌকোয় চড়ি। রাতের নামাজের কাছাকাছি সময়ে রাবেরির কাছে নৌকো থেকে ডাঙ্গার নামি। ফতেপুরে যে শিবির ফেলা হয়েছিল সেইখানে শিবিরবাসীদের সঙ্গে যোগ দিই। ফতেপুরে একদিন অপেক্ষা করি। শনিবার (৬ই ফেব্রুয়ারী) ভোরের আলো ফুটে উঠতেই স্নান সেরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠি। রাবেরির কাছাকাছি জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে মসজিদে নমাজ পড়ি। ইমাম ছিলেন—মৌলানা

মহম্মদ ফারাবি। সূর্য্য উদয়ের সময় আমরা রাবেরির বাঁধের নীচে নৌকায় উঠি। এইদিন আল্লার সেবকদের কথায় আমার মনে কিছু শান্তির বারি সিঞ্চন করে। ঝাকনের বিপরীত দিকে তীরে আমাদের নৌকাগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাকন রাবেরির একটি প্রধান সহর। নৌকাতেই সেই রাতটা কাটাই।

নৌকাগুলি ছাড়বার আদেশ দেওয়া হয় প্রভাতের আলো ফুটবার আগেই। আমি নৌকাতেই সকালের নমাজ পড়ি। নমাজ পড়া শেষ হতেই সুলতান মহম্মদ বকসি পৌঁছে যান। তাঁর সঙ্গে আসে খাজা কালানের ভৃত্য সামসাদিন মহম্মদ। সে কয়েকখানি চিঠি নিয়ে এসেছিল। এই চিঠিগুলি পড়ে এবং পত্রবাহকের মুখেও সংবাদ সংগ্রহ করে কাবুলে যা কিছু ঘটেছে তার বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারলাম। মোহাদ খাজাও নৌকাতেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

মধ্যাহ্নের নমাজের সময় নদীর অপর পারে একটি উদ্যানের কাছে নেমে যমুনায় স্নান করে নমাজ পড়ি। নমাজ শেষ করে আবার আমরা এটোয়ার দিকে আসি এবং গাছের ছায়ায় নদীর বাঁধের ওপর বসে কয়েকজনকে কুস্তির কসরৎ দেখানোর জন্য আদেশ দিই। মোহদি খাবাস যে আহার্য্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেছিল তা এখানেই পরিবেশন করা হয়। সান্ধ্য নমাজের সময় আমরা নদী পার হই। রাতের নমাজের সময় শিবিরে ফিরি আসি। সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য এবং সামসুদ্দিনের হাতে কাবুলে চিঠি পাঠানোর জন্য চিঠি লেখার উদ্দেশ্যে এইখানে দুই তিন দিন অবস্থান করি।

প্রথম জুমেদ মাসের ৩০শে তারিখ বুধবার এটোয়া থেকে রওনা হয়ে আটক্রোশ অতিক্রম করে মুরি ও আদুশায় বিশ্রাম করি। কাবুলে পাঠানোর জন্য যে চিঠিগুলি আগে লেখার সময় পাইনি সেগুলি এই সময় লিখে ফেলি। হুমায়ুনকে লিখি যে দেশের শান্তিভঙ্গকারীদের বিদ্রোহ যদি সম্পূর্ণ দমন না হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে নিজেই যাত্রা করে। যারা লুঠতরাজের জন্য দায়ী তাদের সায়েস্তা করার জন্য তাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে হবে। চিঠিতে এই কথা যোগ করে দিই যে, কাবুল আমারই সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছি। সেইজন্য আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন এই দেশের ওপর কোনও দাবী না রাখে। আমি হিন্দালকেও এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন আমার দরবারে ফিরে

আসে। কামরাণকে লিখি—সে যেন শিষ্টতার চর্চা করে এবং সম্রাটপুত্রের পদমর্য্যাদানুযায়ী। তার কর্ত্তব্য পালন করে। আমি তাকে লিখি যে মুলতান প্রদেশ তাকেই দান করেছি এবং আরো জানিয়ে দিই যে কাবুল আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তাকে একথাও জানাই যে আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে আনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমার অনেক কিছু তৎকালীন ব্যাপার ও তথ্য খাজা কালানকে যে চিঠি লিখি তাতে পাওয়া যাবে মনে করে সেই চিঠির অবিকল নকল এইখানে যোগ করে দিচ্ছি।

'খাজা কালানের স্বাস্থ্য কামনা করি। সামসাদ্দিন মহম্মদ এটোয়াতে পৌঁছিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার কাছ থেকে ঐ দিককার (কাবুল) সমস্ত সংবাদ পাই। আমার পশ্চিমের রাজ্য পরিদর্শন করার যে কি অদম্য ইচ্ছা তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। হিন্দুস্থানের ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা শৃঙ্খলার মধ্যে এসে গিয়েছে। পরম শক্তিমান আল্লার ওপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁর অসীম দয়ায় এমন সময় শীঘ্রই আসবে যখন এই দেশের সমস্ত ব্যাপারই সুশৃঙ্খলভাবে পরিসমাপ্ত হবে। এই রকম অবস্থায় পৌঁছালেই, আল্লার ইচ্ছা হলে, এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে তোমাদের দেশের দিকে রওনা হব।

কি করে আমি ঐ দেশের আনন্দদায়ক দিনগুলির কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি? আমার মত লোক যে সুরাপান ত্যাগের শপথ গ্রহণ করেছে এবং জীবনে পবিত্রতা পালনের সঙ্কল্প করেছে—সে ঐ দেশের সুমিষ্ট খরমুজ ও আঙুরের কথা কি করে ভুলে যাবে? সম্প্রতি ঐ দেশের মাত্র একটি খরমুজ ওরা আমাকে এনে দেয়। সেই খরমুজটি যখন কটি তখন আমার মনে এক অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ এবং দেশ থেকে নির্ব্বাসন জনিত পীড়াদায়ক মনোভাব আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। সেটি খাওয়ার সময় আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি।

তুমি কাবুলের বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে নজর রেখো। আমার বিচারবুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আমি পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে এই ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করেছি এবং এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছি যে—যে দেশে সাত আটজন সর্দার রয়েছে সেখানে কোনও নিয়ম মাফিক শৃঙ্খলাযুক্ত অবস্থা আশা করা যেতে পারে না। আমি সেইজন্য আমার ভগ্নী ও স্ত্রীদের হিন্দুস্থানে চলে আসার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছি।

এও ঠিক করেছি যে কাবুল ও তৎসংলগ্ন দেশ আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হবে। হুমায়ুন ও কামরাণকে এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখেছি। যে চিঠিগুলি এখন পাঠাচ্ছি সেগুলি যেন কোনও বুদ্ধিমান লোক দিয়ে যথাস্থানে বিলি করা হয়। তুমি হয়তো জানো আমি আগেই করণীয় বিষয় সম্বন্ধে মির্জ্জাদের লিখে জানিয়েছি। সেইজন্য এ দেশকে শৃঙ্খলার পথে আনার এবং উন্নতি সাধনের কোনও বাধাবিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক থাকতে পারে না। যদি দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয়, যদি রাজ্যের প্রজাগণ দুঃস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করে' যদি গোলায় খাদ্যশস্য মজুত না থাকে, যদি রাজকোষ অর্থশূন্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সমস্ত দোষ দেশের শাসকের ওপর বর্ত্তাবে।

কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে যার তালিকা আমি নীচে যোগ করছি। কোনও কোনও বিষয়ে তোমাকে আগেই লিখেছি যাতে তুমি প্রস্তুত হতে পার। তালিকাটি এইরূপ :—দুর্গ সম্পূর্ণভাবে মেরামত করতে হবে। শস্যাগার শস্যপূর্ণ করতে হবে, পশু খাদ্যও মজুদ রাখতে হবে। দূতদের আগমনির্গম ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে—যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়, বড় মসজিদ অবশ্যই মেরামত করতে হবে। ফুল ও ফলের বাগানের ওপর যে কর ধার্য্য আছে সেই আয় থেকে ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হবে। স্নানাগার ও দুর্গের অভ্যন্তরে যে অলিন্দ ওস্তাদ আলি ইট দিয়ে তৈরী করেছে এবং যে প্রসাদের এখনও নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই, সেগুলির সংস্কার এবং নির্ম্মাণের কাজ ওস্তাদ সুলতান মহম্মদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ করতে হবে। যদি ওস্তাদ হাসান আলি কোনও নক্সা ইতিমধ্যে করে থাকে তাহলে সে যেন সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়। যদি সে কোনও নক্সা প্রস্তুত না করে থাকে তাহলে তোমরা দুইজন একত্রে আলোচনা করে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করবে। নক্সা করার সময় নজর রেখো যাতে বিচার কক্ষ ও দরবার কক্ষের মেঝের সমতা থাকে। আবার বলছি বাদাসখাকের কাছে ছোট কাবুলে যখন যাবে তখন ওখানকার অট্টালিকাগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে যেন সংস্কার করা হয়। গজনির জলের বাঁধও সম্পূর্ণ মেরামত করার ব্যবস্থা করবে। প্রমোদ উদ্যানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অপ্রচুর। এমন একটি স্রোতস্বতীর সন্ধান করতে হবে যার স্রোতের বেগে একটা কল চলতে পারে এবং সেই স্রোতের জল বাগানে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পূর্ব্বে খাজের (বাস্তের) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি উঁচু জমির পাদদেশ টুটুনদার নদীর

জল এই ভাবে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে আমি নানাজাতের বৃক্ষ রোপন করি। এই উদ্যানের ভবিষ্যৎ এত উজ্জল মনে হয় যে—আমি এর নাম রাখি—'নজের গা' (সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর)। নানা ফলের বাগান থেকে উৎকৃষ্ট গাছ সংগ্রহ করে প্রমোদ উদ্যানে রোপণ করে বাগানের চারিধারে সুগন্ধি পুষ্পের চারা ও গুল্ম নক্সা অনুযায়ী লাগাবার ব্যবস্থা করবে।

গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সৈয়দ খাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এ কথা স্মরণ রেখো যে অস্ত্র নির্ম্মাণ বিশারদ ওস্তাদ মহম্মদ হাসানের যেন কোনও রকম অযত্ন না হয়।

এই পত্র তোমার হাতে পৌঁছানোর পর কোনও রূপ কালক্ষেপ না করে আমার ভগ্নী ও পত্নীদের এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তুমি নিলাব পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আসবে। কাবুল ত্যাগ করার ব্যাপারে যত বাধা বিঘ্নই আসুক না কেন, এই চিঠি পাওয়ার সাত দিন মধ্যেই তাদের কাবুল ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। হিন্দুস্থান থেকে একদল সৈন্য তাদের সঙ্গে করে আনার জন্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। দেরী হলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। যেখানে সৈন্যরা উপস্থিত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ও সৈন্য দলের উপস্থিতির জন্য অসুবিধা হবে।

আবদুল্লাকে যেচিঠি লিখেছি তাতেই উল্লেখ করেছি—অনুতপ্ত হয়ে যে সংযমের নীতি গ্রহণ করেছি তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে খাপ খাওয়াতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বজায় রাখার মত মনেরও জোর আমার আছে।

(তুর্কিতে) 'সুরাপান করি ত্যাগ, মনোপীড়া নিয়ে আছি।
কাজের অযোগ্য হয়ে হতাশায় ভুগছি।
অনুতাপ আমাকে সংযমী করেছে,
সংযম আমার মনে অনুতাপ এনেছে।'

বানাইয়ের একটি গল্প আমার এখনও মনে আছে। সে একদিন মির আলি সেরের পাশে বসে একটা রসাল কথা বলছিল। মির আলিসেরের গায়ে ছিল দামি বোতাম লাগানো কোর্ত্তা। মির বলেছিল-তোমার রসিকতাটা খুবই সুন্দর। আমি তোমাকে আমার গায়ের কোর্ত্তা বকসিস দিতে পারতাম কিন্তু এই বোতামগুলোর জন্যই পারছি না। বানাই উত্তরে বলে—বোতাম কেন বাধা

দেবে ? বোতামের ঘরই বাধা দিচ্ছে। (তুর্কিতে বোতাম ঘরের আর এক অর্থ হচ্ছে নীচতা এবং পুরুষত্বহীনতা)। এই গল্পের সত্যতা অবশ্য যে আমাকে এই গল্প শুনিয়েছে—তারই সততার ওপর নির্ভর করবে। এই নির্বোধ অবান্তর কথা লেখার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। এর জন্য আমাকে ভুল বুঝো না।

চতুষ্পদী কবিতাটি, যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, গত বছর লিখেছিলাম। সত্যই গত বছর সুরার পিপাসা এবং সামাজিক মেলামেশার ইচ্ছাটা মাত্রাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় আমি উপনীত হয়েছিলাম যে হতাশায় ও বিরক্তিতে আমি চোখের জল ফেলতাম। বর্ত্তমান বৎসরে আল্লার অসীম অনুগ্রহে এই যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। এর প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে কবিতার অনুবাদে নিজেকে নিযুক্ত করেছি বলে মন একটা খোরাক পেয়েছে। তোমাকেও আমি এই উপদেশ দিই যে তুমিও যেন সংযমের জীবনই গ্রহণ করো। আমুদে বন্ধুবান্ধব ও পুরোণো প্রাণের সুহৃদদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং সুরাপান অবশ্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু এমন কোন অকৃত্রিম বন্ধু আছে যার সঙ্গে তুমি সামাজিক সুখের পেয়ালায় চুমুক দিতে পার ? সুরাপানের আনন্দ কোন বান্ধবের সঙ্গে উপভোগ করবে ? যদি সের আহম্মদ ও হায়দার কুলির মত লোককে তোমার আনন্দময় মুহূর্ত্তে এবং সুরার পাত্র হাতে নেওয়ার সময় সঙ্গী হিসাবে পাও, তাহলে নিজেকে সে সুখে বঞ্চিত করতে এবং আমার উপদেশে সম্মত হতে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই চিঠি শেষ করছি। শেষ জুমাদা মাসের ১লা তারিখ বৃহস্পতিবার (১১ই ফেব্রুয়ারি) লিখিত ॥"

চিঠিগুলি অনেক কষ্টে লিখে শেষ করে—সমেসউদ্দিন মহম্মদের হাতে দিয়ে এবং তাকে মৌখিক কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিদায় দিই।

শুক্রবার আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে জুমানন্দ্রাতে আসি। কিতিনকারা সুলতানের একজন কর্ম্মচারী কামালউদ্দিন কনাকের কাছে সুলতানের কতকগুলি চিঠি নিয়ে আসে। কামাল উদ্দিনও সুলতানের আর একজন কর্ম্মচারী। সে আমার দরবারে সুলতানের দূত হিসাবে আছে। সেই চিঠিগুলিতে সীমান্তের আমিরদের আচরণ সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। ঐ দিকে ডাকাতি ও নানা ধ্বংসকর কাজ ঘটছে বলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। কনাক ঐ লোকটিকে আমার কাছে পাঠায়। আমি কনাককে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই

এবং সীমান্ত প্রদেশের আমিরদের এই আদেশ জানাই যে তারা যেন ডাকাত ও ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেয় এবং প্রতিবেশী শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। কিতিনকারা সুলতান (বালখের উজবেগ সর্দ্দার) যে লোক পাঠিয়ে ছিল তার সঙ্গেই আমার আদেশ পত্র পাঠাই এবং তাকে এখান থেকেই বিদায় দিই।

হাসান চালেবি পারস্যবাসী ও উজবেকদের মধ্যে জামের নিকট যে যুদ্ধ চলছিল তার বিবরণ দিয়ে সাকুলি নামে একজন লোককে আমার কাছে পাঠায়। আমি পারস্যের রাজার কাছে এই লোকটির মারফৎ চিঠি পাঠাই। চিঠিতে হাসান চালাবিকে কাজের চাপে ছাড়তে না পারায় ক্ষমা প্রার্থনা করি। সাকুলি ২রা তারিখ আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

শনিবারও আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে কলেজি পরগনার অন্তর্গত গাপুর ও হেমামনিতে গিয়ে থামি।

৪ঠা তারিখ, রবিবার আমরা নয় ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা দারেপুরে উপস্থিত হই। এখানে আমার মাথার চুল কামাই। প্রায় দুইমাস আমার মাথার চুল কামানো হয়নি। সেদিন শঙ্কুর নদীতে স্নান করি।

সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারী) চৌদ্দ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা চিরগিরে পৌছাই। পরদিন মঙ্গলবার সকালে কারচের একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য মাহিম বেগমের (বাবরের প্রিয়তমা স্ত্রী, হুমায়ুনের জননী) ফরমান কারচের কাছে নিয়ে আসে। এই ফরমানে (রাজকীয় হুকুমনামা) আদেশ ছিল যে বেরে ও লাহোরের লোকেরা যেন গন্তব্যপথে তার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। আমি যে রীতিতে নিজের হাতে হুকুমনামা লিখে থাকি এটাও সেই ভাবে লিখিত। কাবুলে প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ (১৮ই জানুয়ারি) এই হুকুমনামা লেখা হয়েছিল।

বুধবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী) আমরা সাত ক্রোশ অগ্রসর হয়ে আদমপুর পরগণায় শিবির ফেলি। সেই দিন প্রত্যূষে কোনও সঙ্গী না নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। মধ্যাহ্নের কিছু পরে যমুনার তীরে উপস্থিত হই। নদীর ভাটিতে তীরের কাছাকাছি দিয়ে চলতে থাকি ও আদিমপুরের অপর দিকে পৌছাই। নদীর একটা চড়ার ওপর সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা করে সেখানে মোদক খাই। এইখানে সাদিককে কালানের সঙ্গে কুস্তি লড়ার আদেশ দিই। কালান কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্যই এসেছিল। আগ্রায় সে এই অজুহাত দেখিয়ে

কুস্তি লড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে অনেক দূর থেকে আসায় সে পথশ্রমে ক্লান্ত, সুতরাং তাকে একুশ দিনের জন্য কুস্তি লড়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার আর কোনও অজুহাত দেওয়ার উপায় ছিল না। সাদিক খুব সুন্দর কুস্তি লড়ে। সে কালানকে অতি সহজেই পরাস্ত করে। সাদিককে দশ হাজার মুদ্রা, একটি সজ্জিন অশ্ব ও বোতামযুক্ত কুর্ত্তা উপহার দিই। কালান পরাস্ত হলেও যাতে সে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য তাকেও তিন হাজ র মুদ্রা ও একপ্রস্থ পোষাক দেওয়ার জন্য আদেশ করি।

নৌকার উপরই বন্দুক ও কামানে গোলা ভর্ত্তি করার জন্য আদেশ দিই। এই সময়ের মধ্যে একটি রাস্তা তৈরি করে তার মাটি সমতল করারও নির্দ্দেশ দিই যাতে কামান-বন্দুক নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা না হয়। এই জায়গায় তিন চার দিন অপেক্ষা করি।

শেষ জুমাদা মাসের ১২ই তারিখ (২২শে ফেব্রুয়ারি) সোমবার বারো ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে কোরাতে থামি।

কোরা থেকে পুনরায় বারো ক্রোশ এগিয়ে কোরার একটি পরগণা কুরিয়েতে বিশ্রাম করি (কোরা উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় একটি প্রসিদ্ধ সহর। মাণিকপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে এই সহর অবস্থিত)! কুরিয়ে থেকে আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে ফতেপুর আসওয়াতে পৌঁছাই ও ফতেপুর থেকে আট ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে সেরাইমিদাতে শিবির স্থাপন করি। এখানে বিশ্রাম করার সময় রাতের নামাজের কাছাকাছি সময় সুলতান জালালুদ্দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও অভিবাদন জানায়। সে তার সঙ্গে দুটি ছেলেকেও নিয়ে এসেছিল।

পরদিন সকালে শনিবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে গঙ্গার তীরে কোরার আর একটি পরগণা ডাকডাকিতে পৌঁছাই।

রবিবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা' কাসিম হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান ও তাদিক এই জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সোমবার আসকারিও এইখানে এসে আমাকে অভিবাদন জানায়। এরা সকলেই গঙ্গার পূর্বদিক থেকে আসে। গঙ্গার অপর পারে যেখানে কতক সৈন্য এসে পৌঁছিয়েছে তাদের নিয়ে আসকারিকে অগ্রসর হতে হবে এবং যেখানেই সৈন্যরা বিশ্রাম করবে আস কারিকে তার বিপরীত তীরে শিবির ফেলতে হবে।

আমি এই জায়গার কাছাকাছি থাকার সময় অনবরত আমার কাছে এই সংবাদ আসতে থাকে যে সুলতান মামুদ এক লক্ষ আফগান সংগ্রহ করেছে, সে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেখ বেজিদ ও বিবনকে সারওয়ারের (গোরখপুর) নিকটে পর্য্যুদস্ত করে তাদের পৃথক করে ফেলেছে। সে এবং ফতে খাঁ সেরওয়ানি গঙ্গার দুই তীর আয়ত্তে এনে চুণারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সের খাঁ সুর, যাকে আমি পূর্ব্বে অনুগ্রহ দেখিয়ে কতকগুলি পরগণার অধিকার দিয়ে ঐ দিককার শাসনভার অর্পণ করেছিলাম, সেও আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আরও কয়েকজন আমিরের সঙ্গে সে নদী পার হয়েছে। সুলতান জালালুদ্দিনের লোকজন বেনারস রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে সে জায়গা ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে। তারা অবশ্য এই অজুহাত দেখায় যে তারা বারাণসীর দুর্গ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সৈন্য রেখে এসেছে এবং তারা গঙ্গার তীরে শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছে।

'ডাকডাকি' থেকে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ এগিয়ে এসে কারার দুই তিন ক্রোশের মধ্যে কুশারে শিবির স্থাপন করি। আমি এখানে জলপথে আসি। জালালুদ্দিন সুলতান আমাকে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করায় এখানে আমাদের দুই তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কারার দুর্গ অভ্যন্তরে জালালউদ্দিনের প্রাসাদে আমার অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা হওয়ায় আমি তার অতিথি হিসাবে সেইখানে যাই। সে নিজেই আমার সামনে কয়েকটি থালায় আহার্য্য পরিবেশন করে। আমি তাকে আর তার ছেলেদের প্রত্যেককে একটি সোনার জরি খচিত ইয়াকৃতা, জামা ও নিম্‌চে উপহার দিই। (ইয়াকৃতা—আস্তরণ বিহীন কোর্ত্তা, জামা—লম্বা গাউন, নিম্‌চে—কোমর পর্য্যন্ত ঝুলের কোট বিশেষ)। তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সুলতান মামুদ এই পদবী প্রদান করি।

কারা ত্যাগ করে আমি ক্রোশখানেক অশ্বারোহণে যাই এবং গঙ্গার তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। গঙ্গার তীরে পৌঁছানোর পর মাহামের চিঠি নিয়ে সাবরেক আমার সঙ্গে দেখা করে। চিঠির উত্তর দিয়ে তাকে ফেরৎ পাঠাই। খাজা ইয়াহিয়ার নাতি আমার আত্মকথার যতটা লিখেছি তার নকল চেয়ে পাঠায়। এক প্রস্থ নকল আগেই করা ছিল। সেইটিই সারবেকের হাত দিয়ে পাঠাই।

পরদিন (৬ই মার্চ) রওনা হয়ে চার ক্রোশ এগিয়ে যাওয়ার পর যাত্রা স্থগিত রাখি। আমার নিয়মানুসারে নৌকায় চড়ি! শিবিরের জায়গা বেশী দূরে ছিল না জন্য তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাই। কিছুক্ষণ পর নৌকাতেই আমি

মোদক খাই। খাজা আবদুল সহিদ নূর বেগের বাড়ীতে ছিল। তাকে ডেকে পাঠাই। মোল্লা আলি খাঁয়ের বাড়ী থেকেও আল্লা মামুদকে ডাকিয়ে আনি। কিছুক্ষণ নৌকায় বসে থাকার পর আমরা অপর পারে যাই। সেখানে কুস্তি করার জন্য কয়েকজন কুস্তিগিরকে আদেশ দিই। দোস্ত ইয়াসিন খয়েরকে এই নির্দ্দেশ দিই যে সে প্রথমে যেন শ্রেষ্ঠ মল্লবীর সাদিকের সঙ্গে না লড়ে তার মল্ল নৈপুণ্য যেন অন্যান্য কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়ে দেখায়। কিন্তু আমাদের নির্দ্দেশ চল্‌তি নিয়মের বিপরীত—কারণ রীতি এই যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়তে হয়। যা হোক, সে আট জন বিভিন্ন কুস্তিগিরের সঙ্গে সুন্দর ভাবে কুস্তি লড়ে।

বৈকালিক নমাজের সময় সুলতান মহম্মদ বক্‌সি নদীর অপর পার থেকে নৌকায় এপারে এসে পৌঁছায়। সে সুলতান ইসকান্দারের পুত্র মামুদ খাঁর—যাকে বিদ্রোহীরা সুলতান মামুদ এই গৌরবজনক পদবী দিয়ে সম্মানিত করেছিল—ধ্বংসের বিবরণ নিয়ে এসেছিল। আমার সৈন্যদলের মধ্যে যে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের কাজ নিয়ে ঐদিকে গিয়েছিল সে মধ্যাহ্ন নমাজের সময় ফিরে এসে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গের সংবাদ দেয়। মধ্যাহ্ন ও বৈকালিক নমাজের সময়ের মধ্যে তাজ খাঁ সারংখানির যে একখানি চিঠি আসে তাতেও গুপ্তচরের সংগ্রহ করা সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। জানা গেল যে বিদ্রোহীরা চুণার এসে দুর্গ অবরোধ করে, এমন কি লঘুভাবে আক্রমণও করে। কিন্তু আমার এদিকে আগমনের নিশ্চিত সংবাদ পেয়ে তারা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং দুর্গ অবরোধও তুলে নেয়। যে সব আফগান বারাণসী গিয়েছিল তারাও সেখান থেকে বিশৃঙ্খলভাবে সরে পড়ে। তাদের দুইখানি নৌকা নিমজ্জিত হয় ও তাদের কতক সৈন্য নদীতে ডুবে মারা যায়।

পরের দিনও আমি নৌকায় চড়ি। আধা-আধি ভাটিতে যাওয়ার পর আইসান তাইমুর সুলতান ও তুখ্‌তে বাঘা সুলতানকে দেখতে পাই। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমাকে কুর্ণিশ করার জন্য মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের নৌকায় ডাকিয়ে আনি। তুখ্‌তে বাঘা সুলতান তার কয়েকটি ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখালো। জোর হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বাতাসের বেগ বেড়ে যেতে আমি মোদক খেতে বাধ্য হলাম। আগের দিন একবার মোদক খেলেও এই দিনেও শিবিরে পৌঁছিয়ে আবার খেলাম।

পরদিনও এই শিবিরেই বিশ্রাম নিই।

মঙ্গলবার আবার যাত্রা সুরু হয়। দূরে একটি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত দ্বীপ দেখতে

পাই। নৌকাযোগে সেই দ্বীপে পৌছে ঘোড়ার পিঠে চারদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রহরখানেকের সময় আবার নৌকায় উঠি। নদীর তীর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে আমি অজ্ঞাতসারে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিলাম যার ভেতরটা নদীর স্রোতের টানে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যে মুহূর্ত্তে আমি সেখানে গিয়েছি অমনি ওপরের মাটি ভেঙ্গে পড়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে শক্ত মাটির ওপর পড়লাম। কিন্তু আমার ঘোড়াটা আছাড় খেয়ে পড়লো। যদি আমি ঘোড়ার পিঠেই থাকতাম তাহলে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পড়তে হতো। এই দিনই আমি আনন্দ করার জন্য গঙ্গায় সাঁতার কাটি। সাঁতার দেওয়ার সময় আমি যতবার হস্ত-চালনা করি তার সংখ্যা গণনা করি। দেখলাম যে তেত্রিশবার হস্তচালনা করে গঙ্গা পার হয়ে এসেছি। এ পারে এসে বিশ্রাম না করেই শুধু নিশ্বাস ফেলার সময় নিয়েই আমি অন্য তীরে ফিরে আসি। সাঁতার কেটে প্রত্যেক নদীই পার হয়েছি— কেবল গঙ্গা নদী বাকি ছিল। যেখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে সেইখান থেকে নৌকা চালিয়ে প্রয়াগের দিকে যাই ও রাত দশটা নাগাদ শিবিরে পৌছাই।

বুধবার (১০ই মার্চ) সৈন্যদল যমুনা পার হতে আরম্ভ করে। আমাদের সঙ্গে ছিল চারশ' কুড়িটি নৌকা।

রাজেব মাসের পয়লা তারিখ (১২ই মার্চ) আমি নদী পার হয়ে আসি।

৪ঠা তারিখ সোমবার যমুনার তীর থেকে সসৈন্যে বেহারের দিকে এগোতে থাকি। পাঁচ ক্রোশ এসে লাওয়ানে এসে থামি। অভ্যাস মত নৌকায় চড়ি। সৈন্যরা অবশ্য সারাদিনই পথ চলতে থাকে। আমি এই সময় নির্দ্দেশ দিই যে কামান ও কামানের গাড়ী যেগুলি আদমপুরে নামানো হয়েছে সেগুলো আবার প্রয়াগ থেকে নৌকায় চাপিয়ে জল পথেই পাঠাতে হবে। মাটিতে নেমে আমরা কুস্তিগিরদের নৌকার মাঝি লাহোরি পালওয়ানের (লাহোরের কুস্তিগির) কুস্তি লড়তে লাগিয়ে দিই। দোস্ত তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু সেটা অনেক চেষ্টার পর এবং অতি কষ্টে। তাদের দুইজনকেই এক প্রস্থ করে পোষাক দিই। কিছু দূরেই ঘোলা জলের তুষ নদী। আমরা এই জায়গায় দুই দিন অবস্থান করি। উদ্দেশ্য ছিল নদী পার হওয়ার জন্য এমন একটা জায়গা ঠিক করা যেখানে জল কম এবং একটি রাস্তা তৈরি করা। রাত্রের দিকে একটা নদীপথ আবিষ্কার করা গেল যেখানে ঘোড়া ও উট পার করানো যেতে পারে কিন্তু বোঝাই গাড়ী পার করানো সম্ভব নয়, কারণ জলের তলা টুকরো পাথরে

ভর্তি। যাহোক, আদেশ দেওয়া হলো যে মাল বোঝাই শকটগুলি যে কোনও উপায়ে নৌকায় পার করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ই মার্চ) সেখান থেকে রওনা হই। নৌকায় চড়ে যেখানে তুষ নদী প্রধান নদী গঙ্গায় এসে মিশেছে সেইখানে এসে পৌঁছাই। এই দিন সৈন্যরা ছয় ক্রোশ অগ্রসর হয়।

পরদিন সকালে এই জায়গায় বিশ্রাম নিই।

শনিবার আমরা বারো ক্রোশ এগিয়ে নিলাবে গঙ্গার তীরে পৌঁছাই। সেখান থেকে পরদিন সকালে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ পথ চলার পর একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে বিশ্রাম করি। সেখান থেকে চার ক্রোশ চলার পর নান্নুপুরে পৌঁছাই। এই জায়গায় বাকি খাঁ তার পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে চুণার থেকে এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এই সময় মামুদ বক্সির চিঠি থেকে এই সংবাদ পাই যে আমার পত্নীগণ পরিবারবর্গসহ কাবুল থেকে যাত্রা করেছে।

বুধবার (২৪শে মার্চ) এখান থেকে চুণার দুর্গ দেখতে যাই। চুণার থেকে এক ক্রোশ অগ্রসর হয়ে শিবিরে বিশ্রাম করি। প্রয়াগ থেকে যাত্রা কবার পর আমার শরীরে কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটক দেখা দেয়। এখানকার একজন চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্প্রতি এইখানে আবিষ্কৃত হয়। পদ্ধতিটি এইরূপ। একটি মাটির পাত্রে গোলমরিচের গুড়া সিদ্ধ করা হয়। ফুটন্ত জলে যে গরম বাষ্প উঠতে থাকে সেই ধোঁয়া ঘাগুলিতে লাগাতে হয়। যখন বাষ্প কমে আসে তখন সেই গরম জলে ঘা ধুয়ে ফেলতে হয়। দুই ঘন্টা ধরে এই ভাবে চিকিৎসা চলে।

একটা লোক এসে সংবাদ দেয় যে আমাদের শিবিরের জায়গার কাছাকাছি সে একটা সিংহ ও গণ্ডার দেখেছে। পরদিন সকালে আমরা সেই জায়গাটা ঘিরে ফেলি। হাতী নিয়ে এসে শিকারের জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু কোনও সিংহ বা গণ্ডারের পাত্তা পাওয়া গেল না। শিকারের জন্য যে জায়গাটা ঘেরাও করা হয় তারই এক ধারে একটা বুনো মহিষ দেখা যায়। এই দিন জোড়ো বাতাস উঠেছিল। ধুলোয় ও ঝড়ে আমাদের খুব বিরক্তির কারণ হয়েছিল। যাহোক, জলপথে উজানে বারাণসী থেকে দুই ক্রোশ দূরে শিবিরে ফিরে আসি।

চুণারের চারদিকে জঙ্গলে অনেক হাতী আছে। হাতী শিকারের জন্য যখন সবেমাত্র এই জায়গা থেকে বের হবো সেই সময় বাকি খাঁ এই খবর নিয়ে আসে

যে মামুদ খাঁ শোণ নদীর তীরে এসে পৌঁচেছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমিরদের আহ্বান করে আলোচনা করি যে আচম্বিতে আমাদের শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত কিনা। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা অতিদ্রুত এবং ক্ষণমাত্র সময় ক্ষেপণ না করে দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যাব।

সেইখান থেকে রওনা হয়ে নয় ক্রোশ অতিক্রম করে বান্নুয়ায় (বারাণসী জেলার একটি সহর) এসে পৌঁছাই। এখান থেকে সোমবার সন্ধ্যায় (২৮শে মার্চ) তাহেরকে আগ্রায় পাঠাই। কাবুল থেকে যে সব অভ্যাগতরা এসেছিল —তাদের কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশনামাগুলি সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই দিনও আমি নৌকায় চড়ি। ভোরের আগেই নৌকায় উঠে জৌনপুরের গোমতী নদী যে জায়গায় গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলেছে সেই সঙ্গমস্থলে পৌঁছিয়ে সেখান থেকে নৌকাতেই আরও কিছুদূর উজানে গিয়ে আবার ফিরে আসি। গোমতী সঙ্কীর্ণ ছোট নদী হলেও জলের মধ্যে হেঁটে পার হওয়ার মত কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। সেই জন্য সৈন্যরা বাধ্য হয়ে কখনও নৌকায় ও ভেলায়, কখনও বা সাঁতার দিয়ে, কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াকে জলে সাঁতরিয়ে নদী পার হতে হয়। গত বছব যেখানে ছাউনি ফেলে আমার সৈন্যরা জৌনপুরে এগিয়ে গিয়েছিল সেই শিবির আমি আশ্বারোহণে দেখে আসি।

অনুকূল বাতাস বইছে জন্য বাংলা দেশের একটা নৌকায় পাল খাটিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই নৌকার সঙ্গে একটি বড় নৌকা বেঁধে খুব দ্রুত চালিয়ে নেওয়া হয়। সৈন্যরা বারাণসী ত্যাগ করে উজানের দিকে এক ক্রোশ দূরে শিবির ফেলে। তখন দিনের মাত্র দুই ঘড়ি অবশিষ্ট ছিল। আমরা শিবিরে পৌঁছে যাই কারণ রাস্তায় কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। যে নৌকাগুলো আমাদের পেছনে আসছিল সেগুলোও খুব তাড়াতাড়ি রাতের নমাজের সময় এসে পৌঁছায়। চুণারে আমি এই আদেশ দিই যে যখনই আমি ডাঙ্গাপথে আসবো, মোগল বেগকে সেই রাস্তাটা মাপের ফিতে দিয়ে মেপে ফেলতে হবে। আর প্রায়ই যখন আমি নদী পথে নৌকায় যাই, তখন লুৎফি বেগকে নদীর তীর বরাবর মেপে যেতে হবে। রাস্তার মাপ হলো এগারো ক্রোশ আর নদী তীরের মাপ হলো আঠারো ক্রোশ।

পরদিন (৩০শে মার্চ) এই জায়গাতেই থেকে যাই।

বুধবার (৩১শে মার্চ) নদী পথে যাত্রা করে গাজিপুরের এক ক্রোশ ভাটিতে বেয়ে থামি।

বৃহস্পতিবার (১লা এপ্রিল) যখন শেষ উল্লিখিত স্থানে ছিলাম সেই সময় মহম্মদ খাঁ লাহোরি এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই দিন লাহোর থেকে শেষ জুমেদা মাসের ২০শে তারিখে (২রা মার্চ) লেখা আবদুল আজিজ আখুরের চিঠি পাই। যেদিন এই চিঠি লেখা হয় সেই দিন করাচের হিন্দুস্থানি ভৃত্য, যাকে আমি কালপির নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে পাঠিয়েছিলাম, সে সেখানে পৌঁছেছিল। আবদুল আজিজের চিঠিতে জানতে পারি যে সে এবং অন্যান্য সকলে আমার আদেশ অনুসারে যাত্রা সুরু করেছে এবং শেষ জুমাদা মাসের ৯ই তারিখ (১৯শে ফেব্রুয়ারী) আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে নিলাবে এসে মিলিত হয়েছে। আবদুল আজিজ আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করার জন্য চেনাব পর্য্যন্ত এসেছিল। তারপর তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে আগেই লাহোরে এসে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে এই চিঠি লিখেছে যেটা এখানে পেলাম।

শুক্রবার (২রা এপ্রিল) সৈন্যরা পুনরায় যাত্রা সুরু করে আর আমি আমার রীতি অনুযায়ী জলপথে অগ্রসর হয়ে চুসের বিপরীত দিকে যেখানে আমাদের আগের বছর শিবির ছিল ও যেখানে যাবার সময় সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল এবং আমরা উপবাস পালন করেছিলাম, সেইখানে এসে নৌকা থেকে মাটিতে নামি। আমি অশ্বারোহণে জায়গাটা পর্য্যবেক্ষণ করে আবার নৌকায় উঠি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা নৌকাতেই আমার সঙ্গে আসে। তার পীড়াপীড়িতে আমি একদফা মোদক খাই। সৈন্যরা কর্ম্মনাশার তীরে ছাউনি ফেলে। হিন্দুরা এই নদীর সংশ্রব কঠোরভাবে বর্জ্জন করে। তারা নৌকায় গঙ্গা নদী দিয়ে পার হয়। তাদের বিশ্বাস যদি কেউ কর্ম্মনাশার জল স্পর্শ করে তাহলে তার ধর্ম্ম নষ্ট হবে। তাদের মতবাদের সমর্থনে বলে যে কর্ম্মনাশা নামটির উৎপত্তির কারণই এই।

আমি নৌকায় উঠে পাল তুলে দিয়ে উজানে কিছুদূর যাই এবং ফিরে এসে গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তর তীরে আসি। অন্য নৌকাগুলিকে এই তীরের কাছাকাছি আনা হয়। কিছু কিছু সৈন্য নানারকম ক্রীড়ায় মত্ত হয়। কেউ কেউ বা কুস্তি লড়তে থাকে। সাকি মহসিন চার পাঁচ জনকে কুস্তি লড়তে আহ্বান জানায়। একজনকে সে ধরে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাদে ওয়ান ছিল দ্বিতীয়। সে আবার মহসিনকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে।

এই পরাজয়ে মহসিন অত্যন্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। কয়েকজন ওস্তাদ কুস্তিগিরও আসরে নামে এবং কুস্তি করে।

পরদিন শনিবার সকালে একটি দলকে কর্ম্মনাশা নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের জন্য নিযুক্ত করি। নিজেও রওনা হই। ঘোড়ার সওয়ার হয়ে এক ক্রোশ নদীর উজানে এসেও যখন বোঝা গেল যে নদী পার হওয়ার সুবিধা জনক জায়গা অনেক দূরে তখন আমার অভ্যাস মত নৌকায় উঠে শিবিরে পৌঁছাই। সেনাবাহিনী চুসের এক ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেছিল।

এই দিন আমি আবার ওষুধ ব্যবহার করি। ওষুধটি কিছু বেশী রকমের উত্তেজক দিল।—ফলে আমার সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত বেরোবে বলে মনে হচ্ছিল। এতে আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কিছু দূরেই একটা পঙ্কিল ছোট নদী। পরদিন (৪ঠা এপ্রিল) সকালে আমরা এই জায়গাতেই ছিলাম। কারণ নদীর ধারের রাস্তা মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। সন্ধ্যায় যে হিন্দুস্থানী হরকরাটি আবদুল আজিজের চিঠি নিয়ে এসেছিল তাকে চিঠির উত্তর দিয়ে ফেরত পাঠানো হলো।

সোমবার (৫ই এপ্রিল) সকালে নৌকায় উঠি। বাতাস অনুকূল না থাকায় নৌকা গুণ টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। গত বছর সেনা বাহিনীকে বক্সারের বিপরীত দিকে একটা জায়গায় অনেকদিন থাকতে হয়। সেই জায়গায় পৌঁছিয়ে নদী পার হয়ে তীরে নামি। জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠার জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছিল। সিঁড়ির সংখ্যা চল্লিশের কাছা কাছি তবে চল্লিশের কম ছিল। ওপরের দিকে কয়েকটি মাত্র সিঁড়ি আছে আর সব জলে ভেসে গেছে। আমি আবার নৌকায় চড়ে মোদক খাই। শিবির থেকে কিছু উজানে একটা দ্বীপের মত জায়গা দেখে সেখানেই নৌকা নোঙর করে মল্লবীরদের কুস্তির কসরৎ দেখাতে বলা হয়। রাতের নমাজের সময় আমরা শিবিরে ফিরে আসি। গত বৎসর গঙ্গা নদী সাঁতার পার হয়ে যে জায়গায় আসি—যেখানে এবার শিবির পড়েছে—সেই জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে কেউ বা উটের পিঠে নদী পার হয়েছিল। সেদিন আমি আফিং খাই।

পরদিন (৬ই এপ্রিল) মঙ্গলবার সকালে কাশিম বর্দি, মহম্মদ আলি হাইদার কিতাবদার (গ্রন্থাগারিক) এবং বাবা সেখের সঙ্গে বাছাই করা শ' খানেক লোককে শত্রু পক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হয়। এই জায়গাতেই

-বঙ্গ দেশের দূতকে আমার তিনটি প্রস্তাব তার মনিবকে জানানোর জন্য আদেশ দিই।

বুধবার (৭ই এপ্রিল) ইউনিশ আলি ফিরে আসে। তাকে মহম্মদ জেমান মির্জ্জার কাছে পাঠানো হয়েছিল—বেহারের শাসক পদে তাকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তার মনোভাব কি জানবার জন্য। (মহম্মদ জেমান মির্জ্জা খোরাসানের রাজা বদিয়াজ্জুমান মির্জ্জার পুত্র এবং বাবরের জামাতা)। মহম্মদ জেমান একটা এলোমেলো গোছের উত্তর দিয়েছে। বেহারের সেখজাদা বংশের একজন একখানি চিঠি নিয়ে আসে। তাতে সংবাদ ছিল যে শত্রুপক্ষ বেহার ত্যাগ করে পালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ই এপ্রিল) রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কতকগুলি চিঠি বেহারীদের মধ্যে বিলি করার জন্য মহম্মদ আলি জং জংএর পুত্র তারদি মহম্মদকে পাঠাই। কয়েকজন তুর্কি ও হিন্দু আমির এবং দুই হাজার তীরন্দাজ সৈন্যকে তার সঙ্গে নেওয়ার জন্য আদেশ দিই। খাজা মুরসিদ ইরাকিকে বেহার সরকারে দেওয়ান নিযুক্ত করে তাকেও তারদি মহম্মদের সঙ্গে পাঠানো হয়। পরদিন সকালে সেখ জনি ও ইউনুস আলির সঙ্গে কয়েকটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে মহম্মদ জেমান মির্জ্জা বেহারে যাওয়ার সম্মতি জানায়। আবেদন পত্রে নানা বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল যে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কিছু সৈন্য যেন নিযুক্ত করা হয়। তার অধীনে কাজ করার জন্য কিছু সৈন্য নিযুক্ত করা হলো। সে নিজেও কয়েকজন নিযুক্ত করে।

১লা সাবান শনিবার (১০ই এপ্রিল) এই জায়গায় তিন চার দিন কাটানোর পর পুনরায় যাত্রা করি। এই দিনে একাই দল ছাড়া হয়ে ভোজপুর এবং বিহিয়া (সাহাবাদ জেলায়—বাবরের সময় যে জায়গা সুবাবাংলার মধ্যে ছিল) পরিদর্শন করে শিবিরে ফিরে আসি। সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী একদল বিধর্ম্মীকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে তাদের পরাস্ত করে যেখানে সুলতান মহম্মদ ছিল সেইখানে পৌছায়। সুলতান মহম্মদের সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈন্য। অঘোর অগ্রগামী প্রহরীদের আগমন বার্ত্তা শোনা মাত্র ভয়ে ব্যকুল হয়ে দুইটি হাতীকে হত্যা করে দ্রুতবেগে সরে পড়ে। তার একজন কর্ম্মচারীকে কিছু সৈন্যের সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী ফৌজ হিসাবে পাঠিয়েছিল। আমাদের কুড়িজন সৈন্যের একটি দলের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ হওয়ার পর তাদের অনেকেই পলায়ন করে। কয়েক জনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে বন্দী করা

হয়। একজনের শিরচ্ছেদ করে তাদের দলের দুইজন সেরা লোককে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসে।

পরদিন সকালে (১১ই এপ্রিল) আমরা আবার রওনা হই। আমি নৌকায় উঠি। এই সময় মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে আমার নিজের তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক, ছোড়া, কটিবন্ধ, একটি যুদ্ধ ঘোটক এবং একটি ছত্র উপহার দেওয়া হয়। বেহার সুবার ভার প্রাপ্ত হওয়ায় সে নতজানু হয়ে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানায়। বেহার সরকারের রাজস্ব এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা স্থির করে এই টাকা আমার নিজস্ব কোষাগারে পাঠানোর ভার দেওয়ান হিসাবে মুরসিদ্ ইরাকের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ই এপ্রিল) বিশ্রাম স্থল থেকে আবার যাত্রা করি। আমি নৌকায় উঠি। সবগুলি নৌকা এক সারিতে পাশাপাশি আনার জন্য নির্দ্দেশ দিই। আমি নৌকায় চড়ার পর সমস্ত নৌকা একসঙ্গে চালানোর নির্দ্দেশ দিই। নদীর প্রস্থের অর্দ্ধেকেরও বেশী নৌকায় ভরতি হয়ে গেল। অবশ্য সমস্ত নৌকা এক সারিতে চালানো সম্ভব হলো না—কারণ নদীর গভীরতা কোনও জায়গায় কম কোনও জায়গায় বেশী। কোনও জায়গায় নদীর স্রোতের টান প্রবল আবার কোনও জায়গায় নদীর জল স্থির। এই সব কারণে অনেক সময়েই সমান দূরত্বে রাখা গেল না নৌকাগুলি। নৌকার সারির মধ্যে জলে একটা কুমির (ঘড়িয়াল) দেখা গেল। মানুষের উরুর মত একটা বেশ বড় গোছের মাছ কুমিরের ভয়ে জল থেকে লাফিয়ে একটা নৌকায় পড়ে। সেটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়।

গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে আমি কয়েকটি নৌকার নাম করণ করি। যে নৌকাটি রাণা সঙ্গের সাথে যুদ্ধের আগে তৈরী হয়েছিল সেই 'বাবুরি' নামের পুরাণো নৌকাটির নতুন নাম দেওয়া হলো—'আয়েসঁ'। ঐ বছরেই আরইস্ খাঁ একটা নৌকা তৈরী করে আমাকে পেশকোশ হিসাবে দেয়। সেই নৌকায় এসে নৌকার ওপর উঁচু মঞ্চ নির্মাণের আদেশ দিয়ে নৌকার নাম দিই—'আরাইস (অলঙ্কার)। সুলতান জালাল উদ্দিন যে নৌকাটি আমাকে 'পেশকোশ' হিসাবে দেয় তার ওপর একটা মঞ্চ আগেই তৈরী করা হয়। সেই মঞ্চের ওপর আর একটি মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়ে এর নাম করণ করি—'গুনিয়াইস্। আর একটা ছোট নৌকা যেটা সাধারণতঃ যখন তখন এবং যে কোনও কাজে আমার ভৃত্যরা ব্যবহার করতো—তার নাম দিলাম—'ফরমাস'।

পরদিন শুক্রবার (১৬ই এপ্রিল) এখানেই থাকি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জার বেহার যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সে প্রায় দুই এক ক্রোস দূরে গিয়ে শিবির ফেলে। সেই দিনই সে ফিরে এসে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে দুইজন গুপ্তচর এসে আমাকে জানায় যে মকদুম আলমের নেতৃত্বে বাঙ্গালীরা চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে গণ্ডক নদীর তীরে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। সুলতান মামুদের অধীন একদল আফগানি তাদের পরিবার বর্গ ও আসবাব পত্র দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু তাদের তা করতে না দিয়ে সেনাদলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় আমি মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে বেহারে যেতে নিষেধ করে এক আদেশ পাঠাই এবং সেখ ইসকান্দারকে তিন চার শ' লোক সঙ্গে নিয়ে আগেই বেহারে পাঠিয়ে দিই।

শনিবার (১৭ই এপ্রিল) দুদু এবং তার পুত্র জালাল খান বেহার খানের একজন পত্র বাহক আমার শিবিরে আসে। (দুদু বেহারের আফগান রাজা সুলতান মহম্মদ সা লোহানির স্ত্রী এবং তার নাবালক পুত্র জালান উদ্দিন লোহানির অভিভাবিকা। সুলতান মহম্মদ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান)। জানা গেল যে বাঙ্গালীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে তারা যে কোনও সময় উপস্থিত হতে পারে এই কথা জানানোর ব্যবস্থা করে তারা বাঙ্গালীদের সঙ্গে মারামারি করে কোনও রকমে পালিয়ে নদী পার হয়ে বেহার প্রদেশে পৌঁছেছে। আমার প্রতি আনুগতা প্রদর্শনের জন্য তারা এই দিকেই আসছে।

এই দিনই বাংলার দূত ইসমাইল মিতার কাছে খবর পাঠাই যে আমি যে তিনদফা লিখিত প্রস্তাব তাঁর হাতে দিয়েছিলাম এবং যা তিনি বাংলার দরবারে পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর পেতে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। তিনি অবশ্য অবশ্য জরুরি চিঠি লিখে তাঁর দরবারকে জানিয়ে দেন যে প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটির যথাযথ জবাব অবিলম্বে আমি চাই। তাঁর প্রভু যদি সত্যই বন্ধুজনোচিত মনোভাব এবং শান্তি রক্ষার ইচ্ছা পোষণ করেন তা হলে সেই কথা প্রকাশ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি সত্যই তাঁর ঐ মনোভাব থাকে তাহলে সে কথা জানাতে যেন আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করেন।

রবিবার তারদি মহম্মদ জং জংএর কাছ থেকে একজন সংবাদ বাহক আসে। তার কাছ থেকে জানা গেল যে ৫ই সাবান বুধবার তার অগ্রগামী প্রহরী সৈন্যরা

একদিকে পৌঁছিলে সেখানকার শিকদার অন্য নৌকা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

রবিবার (১৮ই এপ্রিল) আমি আবার যাত্রা সুরু করে আরা পরগণায় এসে থামি। এখানে সংবাদ পাই যে খরিদের (একটি পরগণা—বালিয়া জেলার বাঁশদি তহশীলের অন্তর্গত এবং সিকেন্দারপুরের চার মাইল দূরে অবস্থিত) সেনাবাহিনী গঙ্গা ও সরয়ূর মোহনায় সমবেত হয়েছে এবং একশো, দেড়শোটি নৌকা সংগ্রহ করেঁছে। আমি তখনও বঙ্গদেশের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করে আসছি। সব সময়ে আমি এই মনোবৃত্তি অবলম্বন করে থাকি যে যার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ও শান্তির চুক্তি বিদ্যমান আছে, আমার পক্ষ থেকে কোনও কাজ সেই শান্তির যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। এরা অবশ্য আমায় গতিপথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার দেখাচ্ছে না। তবুও আমার উল্লিখিত নীতির বশে এবং এতদিন তাদের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করায় মনে করলাম যে বাংলার দূত ইসমাইল মিতার সঙ্গে মোল্লা মহম্মদ মজাহাবকে বাংলায় পাঠানো উচিত। স্থির করলাম যে মোল্লা আমার পূর্ব্বের তিনটি প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে তার কি প্রতিক্রিয়া হয় জেনে আমার কাছে ফিরে আসবে।

সোমবার (১৯শে এপ্রিল) বাংলার দূত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে। তাকে বাংলায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি এগিয়ে যাব না পিছিয়ে আসবো তা নির্ভর করবে আমার নিজের মেজাজের ওপর। বিদ্রোহ যেখানেই দেখা দেবে সেখানেই আমি উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ দমন করবো। কিন্তু আমি এইটুকু তাকে জানাচ্ছি যে তার প্রভুর রাজ্য—জলে ও স্থলে—ক্ষতিগ্রস্থ করার আমার ইচ্ছা নাই। তবে তাঁরও সেই মনোভাব দেখাতে হবে। আমার তিনটি প্রস্তাবের একটি হচ্ছে—আমি যে পথ ধরে চলেছি সেই পথ থেকে খরিদের সৈন্যকে সুরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিতে হবে। আমি কয়েকজন তুর্কিকে তাদের সঙ্গী হিসাবে দিতে চাই যাতে তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারে। এই আশ্বাসও দিতে পারি যে তাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না। তারা নিরাপদে তাদের বাড়ী ফিরে যেতে পারবে। যদি তিনি আমার পথ মুক্ত করতে অস্বীকার করেন এবং আমার প্রস্তাবগুলি মেনে নিতে অবহেলা করেন তাহলে তাঁর মাথার ওপর যে বিপদই ঘনিয়ে উঠুক না কেন তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন এবং এরপর যে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবে তার জন্য একমাত্র তিনিই দোষী হবেন।

বুধবার বাংলার রাজদূত ইসমাইল মিতাকে সম্মানসূচক পোষাক ও অন্যান্য উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

২২শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার তুতু ও তাঁর পুত্র জালান খাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের ভরসা ও শুভ কামনা জানিয়ে চিঠি লিখে সেখ জামালির হাতে পাঠাই।

২৫শে এপ্রিল, রবিবার মোল্লা মহম্মদ মজাহাবকে উপযুক্ত উপহার দিয়ে বিদায় দিই॥

সোমবার খলিফা ও অন্যান্য আমিরদের কোনখানে নদী পার হওয়া সুবিধা জনক তা ঠিক করতে পাঠাই।

২৮শে এপ্রিল বুধবার পুনরায় ঘাগরা ও গঙ্গা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী জমি পরীক্ষার জন্য খলিফাকে পাঠাই। আমি ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে আরার কাছাকাছি আসি। উদ্দেশ্য জলপদ্মের ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করা। পদ্মবনের মধ্যে যখন আমি ঘুরছি সেখ গুরণ তখন কয়েকটি তাজা পদ্মবীচি আমাকে দেয়। এগুলো দেখতে অবিকল টাটকা পেস্তার মত। খেতেও সুস্বাদু। এই ফুলকে আমরা বলি—নিলুফর। হিন্দুস্থানীরা একে বলে 'কাওয়েল কাকেরি' আর এর বীচিকে বলে—'ডুদা'।

সোন্ নদী নিকটেই শুনে ঘোড়ায় উঠে সেই দিকে গেলাম। সোন্ নদীর ভাটিতে মুনিরে অনেক রকমের গাছ আছে। (গাজিপুর জেলার মুনির একটি সহর)। আমরা শিবির ছেড়ে এতদুর এসেছি আর মুনির যখন এত নিকটে তখন সোন্ নদীর ভাটিতে তিন চার ক্রোশ গিয়ে মুনিরে পৌছাই। এইখানে সেখ সরাফউদ্দিন মুনিরের পুত্র ইয়াহিয়ার সমাধি আছে। (সেখ ইয়াহিয়া বেহারের খ্যাতনামা সুফি সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সম সাময়িক। ১৩৮০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সোন্ এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তাঁর সমাধিক্ষেত্র মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র বলে গণ্য)।

মুনিরের উদ্যানগুলির মধ্যে ঘুরে আমি সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করি। তারপর সোন নদীর তীরে এসে নদীতে স্নান করি। দুপুরের নমাজের কিছু পূর্ব্বেই শিবিরে ফিরে আসি। আমাদের কয়েকটি ঘোড়া পথ চলার শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমাদের নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করতে হয়। ক্লান্ত ঘোড়াগুলির পরিচর্য্যার জন্য কয়েকজনকে সেখানেই রেখে আসতে হলো। আদেশ দিলাম যে ঘোড়াগুলির বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তাদের ক্লান্তি দুর হলে তারা যেন

ধীরে সুস্থে ঘোড়াগুলিকে পরে নিয়ে আসে। এই রকম ব্যবস্থা না করলে আমাদের অনেকগুলি ঘোড়াকেই হারাতে হতো। মুনির থেকে চলে আসবার সময় আদেশ দিই যে সোন নদীর তীর থেকে শিবির পর্য্যন্ত আসতে একটা ঘোড়া যতবার পদক্ষেপ করবে সেই সংখ্যা গুণতে হবে। গণনায় দেখা গেল যে তেইশ হাজার একশ' হয়েছে—যা মানুষের ছেচল্লিশ হাজার দুইশ' পদক্ষেপের সমান—অর্থাৎ সাড়ে এগারো মাইল। (৪০০০ পদক্ষেপ—এক মাইল)। মুনির থেকে সোন্ নদীর দূরত্ব এক মাইল। সুতরাং শিবিরে ফিরতে আমাদের বারো মাইল পথ আসতে হয়েছে। তা' ছাড়া নানা জায়গা ঘুরে দেখতে আমাদের সেদিন মোটের ওপর পনেরো ষোলো মাইল পথ চলতে হয়েছে। রাতের প্রথম প্রহরের ছয় ঘড়ির (রাত প্রায় সাড়ে আটটা) পর আমরা শিবিরে ফিরে আসি।

বৃহস্পতিবার (২৯শে এপ্রিল) সকালে সুলতান জুনিদ বিরলাস জৌনপুর থেকে সৈন্য নিয়ে পৌছায়। তার বিলম্বের জন্য অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি। তাকে ভর্ৎসনা করি। তাকে প্রত্যভিবাদন করি না। আমি কিন্তু কাজিজিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করি।

এই দিনই আমি তুর্কিও হিন্দু আমিরদের আলোচনা সভায় আহ্বান করে কোনখানে নদী পার হওয়া সুবিধাজনক হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের অভিমত গ্রহণ করি। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় যে গঙ্গা ও সরযূ নদীর মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় ওস্তাদ আলি কামানগুলি সাজাবে এবং গোলন্দাজদের প্রস্তুত রেখে সেখান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করবে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু ভাটিতে একটা দ্বীপের মত জায়গার বিপরীত দিকে—যেখানে অনেকগুলি নৌকা জমায়েত হয়েছে—মুস্তাফা বেহারের দিকের গঙ্গার তীরে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি নিয়ে গোলাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তার অধীনে কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্যকেও নিযুক্ত করা হবে। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং আরও অনেককে মুস্তাফার পেছনে ঘাঁটি করে মুস্তাফাকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফার কাজে সহায়তার জন্য কয়েকজন ওভারসিয়ার ও পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। তাদের কাজ হবে—যে সব শ্রমিক মাটি খোঁড়া, মাটি ফেলে জায়গা উঁচু করা, কামান ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করার কাজে নিযুক্ত থাকবে এবং যারা যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা বারুদ বহন করে যথাস্থানে মজুত করবে—তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা। আস্‌কারি, সুলতান এবং খাঁরা যাদের

ওপর কাজের ভার পড়েছে তারা দ্রুত যাত্রা করে হলদি ঘাটের কাছে নদী অতিক্রম করবে। যখন গোলাবর্ষণের জন্য কামান ইত্যাদি বসানোর কাজ শেষ হবে তখন তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এইভাবে শত্রুদের নানা দিক দিয়ে আক্রমণ করতে হবে।

সুলতান জুনিদ ও কাজি জ্বিয়া আমাকে জানায় যে আট ক্রোশ উজানে নদী পারের একটা ভাল জায়গা আছে। একজন মাঝি এবং সুলতান জুনিদ, মহম্মদ খাঁ ও কাজি জিয়ার লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে জারদরুকে সেই পার হওয়ার জায়গাটিরে সন্ধান করতে এবং সম্ভব হলে সেইখানে নদী পার হয়ে যেতে আদেশ দিই। আমার লোকেরা সংবাদ পায় যে বাঙ্গালীরা হলদির ঘাট পাহারা দেওয়ার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করার মতলব করছে। ইস্‌কান্দারপুরের শিকদার ও মামুদ খাঁয়ের কাছ থেকে খবর এলো যে তারা হলদিঘাটের কাছে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকা সংগ্রহ করে মাঝি মাল্লাও ভাড়া করেছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এইদিকে আসছে শুনে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সরযু নদী পার হওয়ার একটা পথ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে যারা নদী পার হওয়ার জায়গা ঠিক করতে গিয়েছে তাদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করেই আমি শনিবারে আমিরদের আবার আলোচনা সভায় ডাকি। তাদের বলি ইসকান্দারপুর চতুর্ম্মুখ থেকে অযোধ্যা এবং বারহাজ (গোরখপুর জেলার একটি সহর) পর্য্যন্ত সমস্ত নদীতে হেঁটে পার হওয়ার অসংখ্য জায়গা আছে। আমার মতলব এই রকম— সেনা বাহিনীকে ছয় ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে। প্রধান সেনা বাহিনীকে হলদি ঘাটে নদী পেরিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রতিরোধ পরিখা থেকে বের করে এনে যতক্ষণ না ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফা নদী পার হয়ে এসে কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সাজিয়ে গোলাবর্ষণ সুরু করতে পারে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি স্বয়ং নদী পার হয়ে ওস্তাদ আলি কুলিকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্য নিয়ে সতর্ক হয়ে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবো। সৈন্য বাহিনীর প্রধান দল পথ করে নিয়ে শত্রুর কাছাকাছি পৌছিলে আমার দিক থেকে আক্রমণ সুরু করবো। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং অন্যান্য যাদের বেহারের দিকে গঙ্গার তীর থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে তারা মুস্তাফাকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়বে।

এই রকম বন্দোবস্ত ঠিক করে গঙ্গার উত্তরের সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করা হলো। আসকারির অধীনের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হলো প্রথম দল।

অধিনায়ক স্বয়ং আসকারি। দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক হলো সুলতান জালাল-উদ্দিন সারকি। তৃতীয় দল গঠিত হলো কাসিম্ হোসেন সুলতান, বিয়াকুব সুলতান, ইৎমিস্ সুলতান, মামুদ খাঁ লোহানি গাজিপুরি, কুকি বাবা বাস্কে, তুনমিস উজবেক, কুবরণ চিরখি, হুসেন খাঁ এবং উজবেক সুলতানদের নিয়ে। তাদের সঙ্গে থাকবে দরিয়া খণিয়ারা (যারা নদীর তীর এবং নদীর স্রোতের ওপর লক্ষ্য রেখে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে)। চতুর্থ সৈন্য দলের পরিচালনার ভার দেওয়া হলো মুসা সুলতান ও সুলতান জুনিদ বিরলাসের ওপর। তাদের সঙ্গে ছিল জৌনপুরের কুড়ি হাজার সৈন্য। প্রতিটি বিভাগের সৈন্যদের যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়ে রবিবার সন্ধ্যাতেই যুদ্ধযাত্রায় রওনা করে দেওয়ার জন্য কয়েকজন দক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হলো।

২২শে সাবান (২রা মে), রবিবার সেনাবাহিনী নদী পার হতে সুরু করে। আমি দিনের প্রথম প্রহরে (সকাল ছয়টা) নৌকায় নদী পার হই। জর্দরুই তার দলবল সহ দুপুরে ফিরে আসে। নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থানের তারা সন্ধান পায়নি। তবে তারা নৌকার সন্ধান পেয়েছে এবং পথে সৈন্যদের নৌকাগুলির দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে।

২৪শে সাবান (৪ঠা মে) যেখানে নদী পার হই সেখান থেকে আমরা এক ক্রোশে পথ চলে নদীর সঙ্গম স্থলে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে এসে পৌঁছাই। আমি নিজে ওস্তাদ আলি কুলির কামান দাগার ব্যাপার উপভোগ করার জন্য এগিয়ে যাই। কামানের গোলা বর্ষণ করে সে আজ দুইটি শত্রুপক্ষের নৌকা ভেঙ্গে চূর্ণ করে ডুবিয়ে দেয়। মুস্তাফাও তার দিক থেকে একই ভাবে কাজ করতে থাকে। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বড় কামান নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। মোল্লা গোলামকে কামানটি ঠিক জায়গায় বসানোর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে কয়েকজন ভাসাওয়াল (মাটি কাটার কুলির সর্দ্দার) এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন সাহসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে শিবিরের মুখোমুখি নদীর চরে চলে আসি। সেখানে মোদক খাই।

তখনও আমার মোদকের নেশা যায় নি। নৌকাটিকে শিবিরের কাছে আনিয়ে নৌকাতেই ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। রাতের তৃতীয় প্রহরে চীৎকার ও গোলমাল শোনা যায়। খানসামারা ও আরও অনেকে নৌকা থেকে কাঠ টেনে নিয়ে 'মার, মার' করে চীৎকার করতে থাকে। গোলমালের কারণ এই রকম শোনা যায়। আমি 'আসাইস্' নামে যে নৌকায়

ঘুমাচ্ছিলাম তার পাশাপাশি 'ফরমাইস' নামে নৌকায় একজন নৈশ প্রহরী ছিল। সে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে দেখতে পায় যে একজন লোক 'আসাইসের' ওপর হাত রেখে নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছে। সকলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটি জলে ডুব দেয় আবার ভেসে ওঠে। রক্ষীর মাথার দিকে তাক করে একটা কিছু নিক্ষেপ করে। তাতে তার মাথাটা একটু জখম হয়। তারপর ডাঙ্গায় উঠে দৌড়ে পালায়। এর আগেও একবার যখন আমরা মুনির থেকে ফিরছিলাম সেই রাত্রে দুই জন রাত্রের প্রহরী কয়েকজন হিন্দুস্থানিকে নৌকার কাছে দেখতে পেয়ে তাদের তাড়া করে তাদের দুইখানি তরবারি ও একটি ছোড়া ছিনিয়ে নিয়ে আসে।—

(ফার্সিতে) "বিশ্বের যত তরবারি আছে,
যতই খুসী ঘুরাও না,
বিশ্বপতির হুকুম ছাড়া
একটি শিরাও কাটবে না।"

পরদিন (৫ই মে) বুধবার আমি 'গুঞ্জাইসে' চড়ি। যেখান থেকে কামানের গুলিবর্ষণ চলছে সেইখানে উপস্থিত হয়ে আমি প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজ ঠিক করে দিই। আউখান বরদিমোগেলের অধীনে এক হাজার সৈন্যকে নদীর দুই তিন ক্রোশ উজানে নদী পার হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে নির্দ্দেশ দিই। তারা এগিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় যে আসকারির শিবিরের কাছে বিশ ত্রিশ খানি বাঙ্গালীর নৌকা নদী পার হয়ে এসেছে। আমাদের কোনও এক সৈন্য দলের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্যও তীরে নেমেছে। আমার লোকেরা ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাদের কতক পালিয়ে যায়। কতককে বন্দী করে তাদের শির কেটে ফেলা হয়। অনেকে আহত হয়। তাদের সাত আটটি নৌকা আটক করা হয়। সেইদিনই বাঙ্গালীরা মহম্মদ জেমান মির্জ্জার শিবিরের কাছে (গোগরা ও গঙ্গানদীর সঙ্গম স্থলের কিছু নীচে—গঙ্গানদীতে) নেমে তার ওপর আক্রমণ সুরু করে। সে দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সম্মুখীন হয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং তাদের পিছু ধাওয়া করে। তিনটি নৌকা বোঝাই লোককে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একটি নৌকা আমার কাছে আনা হয়।

এই ব্যাপারে বাবা চিরে বিশেষ সাহস দেখিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমি

ইয়াক খাজা, ইউনুস আলি, আউথান বর্দি এবং যে দল নদী পার হওয়ার জন্য পূর্বেই নিযুক্ত হয়েছিল তাদের যে সাত আটখানি নৌকা আউথান বর্দি ও তার লোকরা আটক করেছে তাতে চড়ে কিছু উজানে গিয়ে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে নদী পার হতে আদেশ দিই।

এই দিনই আসকারির কাছ থেকে একজন সংবাদ বাহক আসে। সে জানায় যে তার সেনাবাহিনীর সকলেই নদী পার হয়ে এসেছে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করি যে আমাদের অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য যারা নদী পার হতে পেরেছে তারা আসকারির সঙ্গে সহযোগিতা করে যেন এক সাথে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় ওস্তাদ আলির কাছ থেকে একজন লোক এসে জানায় যে কামান দাগার প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে। সে এখন আমার উপদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাকে গোলা ছোড়ার জন্য আদেশ দিই এবং আমার পৌঁছানোর আগেই আর একটি কামানে গোলা বোঝাই করে রাখার জন্য নির্দেশ দিই।

বৈকালিন নমাজের সময় বঙ্গদেশের একটি ছোট নৌকায় চড়ে যেখানে কামান সাজানো আছে সেইখানে যাই। ওস্তাদ একবার খুব বড় গোলা এবং তারপর কয়েকবার ফিরিঙ্গি গোলা দাগে। বাঙ্গালীরা গোলন্দাজি কৌশলে নিপুণ বলে খ্যাত। এইবার তাদের নিপুণতা দেখবার সুযোগ পেলাম। তারা কোনও বিশেষ লক্ষ্যের দিকে গুলি ছোড়ে না। এলো মেলো ভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। বৈকালিক নমাজের পর আমি কতকগুলি নৌকাকে সারু (সরযু) নদীর উজানে শত্রুপক্ষের সম্মুখ দিকে নৌকা বেয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিই। যাদের নৌকা চালানোর জন্য আদেশ দেওয়া হলো তারা নির্দ্বিধায় অরক্ষিত অবস্থাতেই কুড়িটি নৌকা বেয়ে নিয়ে আসে। ইশান তাইমুর সুলতান, বাবা সুলতান, আরাসি খাঁ ও সেখ গুরেনকে আদেশ দিই যেখানে নৌকাগুলি আছে সেখানে যেন তারা সতর্ক পাহারা দেয়। আমি তারপর সেইস্থান ত্যাগকরে রাত্রের প্রথম প্রহরে শিবিরে ফিরে আসি।

মধ্যরাত্রে নদীর উজানে যে সব নৌকা জময়েত হয়েছে সেখান থেকে সংবাদ আসে যে আদেশ মতই সমস্ত কাজ হয়েছে এবং নৌকাগুলি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু নদীর একটা সরু মুখ বাঙ্গালীরা নৌকা দিয়ে বন্ধ করে দখল করে আছে

এবং আমাদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তারা আমাদের আক্রমণ করতে বেরিয়ে আসছে। আমাদের একজন নৌকার মাঝির গুলির আঘাতে পা ভেঙেছে। তারা আর অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার প্রাতে গোলন্দাজ বাহিনীর লোকের কাছে সংবাদ পাই—যে সব নৌকা উজানে ছিল সেগুলো এসে পৌঁছেছে। শত্রুপক্ষের সমগ্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুত যাত্রা করে যে সব নৌকা রাত্রে রওনা হয়ে গিয়েছিল সেইদিকে আসি। একজন পত্র বাহককে জোর কদমে মহম্মদ সুলতান মির্জা এবং যে সব লোককে নদী পার হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে এই জরুরি বার্ত্তা জাগতে পাঠাই যে তারা যেন কাল বিলম্ব না করে আসকারির সঙ্গে মিলিত হয়। নৌকাগুলি রক্ষায় নিযুক্ত ইলাত তাইমুর সুলতান ও তুখ্‌তে বুঘা সুলতানকে আদেশ দিই যে তারা যেন নদী পার হতে কোনও রকমে বিলম্ব না করে। বাবা সুলতান তখনও নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। এই সময় ঈশান তাইমুর সুলতান তার ত্রিশ চল্লিশ জন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় ওঠে। তারা ঘোড়ার কেশর ধরে নৌকার ধারে ধারে তাদের সাঁতরিয়ে নিয়ে অপর পারে এসে ওঠে। প্রথম দলকে নদী পার হতে দেখে বাঙ্গালী পদাতিক সৈন্যের একটি বড় দল তাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে। ঈশান তাইমুর সুলতানের সাত আটজন অনুচর ঘোড়ায় উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সংঘর্ষে ব্যাপৃত রেখে ঈশান তাইমুরকে প্রস্তুত হবার সময় করে দেয়। এই সময় পেয়ে তাইমুর সুলতান যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চাপে। এর মধ্যে দ্বিতীয় নৌকাখানাও নদী পার হয়ে এসে পড়ে। তখন সে শত্রুপক্ষের বৃহৎ পদাতিক বাহিনীর সম্মুখীন হয়। ত্রিশ পঁইত্রিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে অদ্ভুত কৌশলে লড়াই করে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই ব্যাপারে সে নানা বিষয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করে।৫ প্রথমতঃ সে অত্যন্ত সাহসিকতা দেখিয়ে অতি দ্রুত সর্ব্ব প্রথমে নদী পার হয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সে শত্রুপক্ষের বিপুল পদাতিক বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে পর্য্যুদস্ত করে। তুখ্‌তে বুখা সুলতানও নদী পার হয়ে আসে। তারপর অন্য নৌকাগুলি পরপর এ পারে চলে আসে। লাহোরি ও হিন্দুস্থানিরা পৃথক পৃথক ভাবে কেউ কেউ বা সাঁতার দিয়ে কেউ কেউ বা নলখাগড়ার আটির ওপর উঠে নদী পার হয়।

যে সব বাঙ্গালীর নৌকা নদীর ভাটিতে কামান ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে ছিল তার আরোহীরা কি ব্যাপারে ঘটতে চলেছে দেখতে পেয়ে নৌকাগুলি নিয়ে নদীর ভাটার দিকে পালাতে সুরু করলো। দরবেশ মহম্মদ সারবান, দোস্তইসাক আগা, মুরবেগ এবং আমাদের সৈন্যদলের অনেকেই কামান ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুলতানদের কাছে লোক পাঠিয়ে আমি এই ইচ্ছা জানাই যে তারা যেমন এক সঙ্গে নদী পার হয়ে এসেছে সেই ভাবেই যেন একত্র হয়ে যখন শত্রু সৈন্য নিকটে আসবে তখন তাদের পার্শ্ব ভাগ থেকে আক্রমণ করে। সুলতানরা উপদেশ মত যেমন তিন চার ভাগে নদী পার হয়েছিল সেই ভাবেই শত্রুর দিকে এগোতে থাকে। তাদের আসতে' দেখে শত্রুপক্ষ তাদের পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য নিয়োগ করে। তারপর তারা পদাতিকদের অনুসরণ করে তাদের সাহায্যের জন্য পেছনে আসতে থাকে। আসকারির সৈন্য বাহিনীর একটি দল নিয়ে কুকি এক পাশে পৌছায় আর সুলতানরা অন্য পাশ দিয়ে এসে আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা শত্রু সৈন্যদের ওপর প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করে। অনেককে বন্দী করে। শেষ পর্য্যন্ত তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে। কুকি বসন্তরাও নামে একজন বিধর্মী পদস্থ ব্যক্তিাক ধরে ফেলে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে। তার দশ পনরো জন সঙ্গী যারা তাকে সাহায্য করতে এসেছিল তাদেরও সেখানেই হত্যা করে। তুখ্‌তে বুঘা সুলতান শত্রু সৈন্যের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়। দোস্ত ইসাক আঘাও নির্ভীকতার পরিচয় দেয়। মোগল আবদুল ওয়াহাব এবং তার ছোট ভাইও বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোগল সাঁতার না জানলেও উরস্থাণ নিয়েই ঘোড়ার কেশর দৃঢ়ভাবে ধরে নদী পার হয়।

আমার নিজের নৌকা তখনও পেছনে ছিল। সেগুলি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠাই। প্রথমে এলো—'ফরমাইস্‌! তাতে উঠে নদী পার হয়ে বাঙ্গালীদের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করি। তারপর 'গুণজাইসে' উঠে নদীর ওপরের দিকের বাঁকের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। মির মহম্মদ জলেবান জানায় যে ওপরের দিকে (উজানে) সরযু নদী পার হওয়ার অনুকূল স্থান পাওয়া যাবে। আমি সেনা বাহিনীকে আদেশ পাঠাই যে তারা যেন অতি দ্রুত তার উল্লিখিত পথে পার হয়ে যায়। মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা ও অন্যান্য যাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল—তারা নদী পার হওয়ার সময় ইয়াকে খাজার নৌকা জলে

ডুবে যায়। ইরাকে খাজা আল্লার দরবারে চলে যায়। আমি তার সৈন্য ও সরকারের ভার তার ছোট ভাই কাসিম খাঁকে অর্পন করি।

মধ্যাহ্নে নমাজের সময় যখন আমি ওজু করছি, সুলতানরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি তাদের কাজের উচ্চ প্রশংসা করি। তারা যে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ও অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করি। আসকারিও সেই সময় আসে। এই প্রথমবার সে যুদ্ধ ব্যাপারটি দেখে। তার পক্ষে এটি মঙ্গলসূচক বলেই মনে হয়েছে। সে রাতে শিবিরের সাজ সরঞ্জাম না এসে পৌছায় আমি 'গুণজাইসের' পাটাতনের ওপর নিদ্রা যাই।

শুক্রবার (৭ই মে) খরিদ সরকারের নিরহান পরগণার গুণদনে গ্রামে নামি। (নিরহান পরগণা গোগরা নদী তীরে॥ সিকেন্দারপুরের দশ মাইল দূরে নদীর অপর পারে অবস্থিত)।

রবিবার (৯ই মে) কুকিকে তার লোকজন সহ সংবাদ সংগ্রহের জন্য হাজিপুরে পাঠাই। সা মহম্মদ মারুফ গত বছর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছিলাম। তাকে সারণ জেলাটির (বাংলা দেশের পাটনা বিভাগে) ভার দিই। সে অনেকবার আমার সন্তোষজনক কাজ করেছে। সে দুই দুইবার তার পিতাকে (মারুফ ফারমুলি) পরাজিত করেছে। যখন সুলতান বেজিদ কৌশলে বেহার জয় করে সেই সময় বিবণ ও সেখ বেজিদ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। সে তখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সময় আমি তার কয়েকটি চিঠি পাই। তখন তার সম্বন্ধে নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছিল। আসকারি যখন হলদি অতিক্রম করছে সেই সময় সে তার দলবল নিয়ে আসকারির সঙ্গে দেখা করে এবং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসকারির সঙ্গে যোগ দেয়। আমি এখানে থাকার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানায় এবং আমার কাজে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আমরা বারংবার সংবাদ পাই যে বিবন ও সেখ বেজিদ সরযু নদী পার হওয়ার মতলব করছে। এই সময় একটি অপ্রত্যাসিত সংবাদ সম্‌বল থেকে আসে। আলি ইউসুফ সেখানকার অধিনায়ক। সে সেখানে ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলা আনার ও সেই রাজ্যে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্ত্তন করার কাজে নিযুক্ত ছিল। সে ও আর একজন যে তার চিকিৎসক হিসাবে তার কাছে থাকতো তারা দুজনেই একদিনে মারা যায়। আমি আবদাল্লাকে সমবলে রওনা হওয়ার জন্য আদেশ দিই যাতে সে উপস্থিত হয়ে সে দেশের সরকারে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে

পারে। ৫ই রমজান (১৪ই মে) সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়।

এই সময় চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে থেকে একখানি চিঠি পাই। সে জানিয়েছে যে সব আমিরকে কাবুল থেকে আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে আসার জন্য নির্দ্দেশ গিয়েছে তারা তার সঙ্গে আসতে পারবে না। মহম্মদি, ও আরও কয়েকজন সুলতানের সঙ্গে একশ' ক্রোশ দূরে লুণ্ঠন অভিযানে যায়। সেখানে বালুচিদের গুরুতর শিক্ষা দেয়। আমি আবদাল্লার সঙ্গে চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে এক হুকুমনামা পাঠিয়ে জানাই যে সুলতান মহম্মদ দলদাই, মহম্মদি ও আরও কয়েকজন আমিরের কাছে নির্দ্দেশ গিয়েছে যে তারা যেন আগ্রায় তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দিকেই শত্রু দেখা দেবে সেই দিকে ধাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে।

৮ই রমজান্ (১৭ই মে) সোমবার দরিয়া খাঁয়ের পৌত্র জালাল খাঁ কয়েক জন বিশিষ্ট আমিরের সঙ্গে এখানে পৌঁছায়। তাকে নিয়ে আসার জন্য জামালি খাঁকে পাঠানো হয়েছিল। জালাল খাঁ আমার সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানায়। এই দিনই ইয়াহিয়া লোহানি—যে পূর্ব্বে তার ছোট ভাইয়ের মারফৎ আমার কাজে নিযুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় জানিয়েছিল এবং যাকে এক সদয় পত্র লিখে আশ্বস্ত করেছিলাম—এসে পৌঁছায় এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সাত আট হাজার লোহানি আফগানি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার আশা নিয়ে আসে। তাদের মনস্তুষ্টির জন্য এক কোটি টাকা বেহারের রাজস্ব থেকে পৃথক রাখার জন্য নির্দ্দেশ দিই। তার মধ্যে মহম্মদ খাঁ লোদিকে দিই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট অংশ জালাল খাঁকে দিই। তাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমার কাজের জন্য আরও এক কোটি টাকা যেন পৃথক ভাবে আদায় করা হয়। মোল্লা গোলাম যশ ওয়ালকে সেই টাকা আনার জন্য পাঠানো হয়। জৌনপুর সরকারের শাসন ভার আমি মহম্মদ জেমান মির্জ্জার ওপর অর্পণ করি।

বুধবার (১৯শে মে) গোলাম আলি নামে খলিফার একজন ভৃত্য ইসমাইল মিতা তাঁর দরবারে পৌঁছানোর পূর্ব্বেই মুঙ্গেরের রাজার আবদুল ফতে নামে একজন ভৃত্যের সঙ্গে তিনটি শান্তি প্রস্তাব নিয়ে মুঙ্গেরের শাসক ও উজির হাসান খাঁ লস্করের কাছে যায় এবং খলিফার নামে পত্র নিয়ে আবুল ফতের সঙ্গেই ফিরে আসে। তাঁরা ঐ তিনটি প্রস্তাবে বাংলার রাজা নসরৎ সাহের পক্ষ হয়ে সম্মতি জানায় এবং শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমার এই

অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী আফগানদের শাস্তি দেওয়া। তাদের মধ্যে কতক দূরে পালিয়েছে। অনেকে আমার কাজে যোগদান করেছে। তাদের মধ্যে কিছু এখনও বাঙ্গালীদের আশ্রয়ে আছে। বাঙ্গালীরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবে এই ভার নেওয়ায় এবং বর্ষাকাল আসন্ন দেখে আমি শান্তি চুক্তি ও পূর্ব্ব উল্লিখিত চিঠিগুলি অনুমোদন করে পাঠাই।

শনিবায় (২২শে মে) ইসমাইল জালওয়ানি, আমুয়াল খাঁ লোহানি, আউলিয়া খাঁ উস্তারানি এবং তাদের সঙ্গে আরও পাঁচজন আমির তাদের বশতো জ্ঞাপন করার জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

এই দিন আমি ইশান তাইমুর সুলতান ও তুক্‌থে বুঘা সুলতানকে (এই দুই জন ছোট খাঁ সুলতান আমেদ খাঁর পুত্র) একটি তরবারি ও কটিবন্ধ, কটিবন্ধ সহ ছোড়া, বর্ম্ম, সম্মানসূচক পোষাক ও তিপ্‌চাক অশ্ব উপহার দিই। ইসান তাইমুর সুলতানকে নারনুল তহশিল (পাতিয়ালা রাজ্যের তহশিল) থেকে ছত্রিশ লক্ষ টাকা এবং তুখ্‌তে বুঘা সুলতানকে সামসাবাদ পরগণা থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য আদেশ দিই। তারা নতজানু হয়ে আমাকে শ্রদ্ধা জানায়।

১৫ই রমজান, সোমবার (২৪শে মে) বাংলা ও বেহারের ব্যাপারগুলির সমস্ত কাজ সমাধা করে গুণদনের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে শিবির তুলে বিদ্রোহী বিবন ও সেখ বেজিদের শক্রুতা দমন করতে যাত্রা করি। দুই দিন পথ চলার পর তৃতীয় দিন বৃহস্পতিবার আমরা চৌপাড়া চতুর্ম্মুখের (বর্ত্তমানে ছাপড়া—পূর্ব্বে বঙ্গ দেশভুক্ত সারণ জেলার প্রধান সহর) পথে সেকেন্দারপুরে পৌঁছাই। সেই দিনই আমার লোকেরা নদী (ঘোগ্‌রা) পার হওয়ার জন্য উদ্যোগ সুরু করে। অনবরত সংবাদ আসতে থাকে যে বিদ্রোহীরা সরযু ও ঘোগরা পার হয়ে লক্ষ্ণৌ-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের গতিরোধ করতে আমার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি কর্ম্মচারীদের মধ্যে সুলতান জালাল উদ্দিন সারকি (জেনিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা), আলি খাঁ ফারমুলি, তার্দিকে নিজাম খাঁ, সালি কারিমিস, উসেখ, কুরবান চিরখি, হুসেন খাঁ দরিয়াখানিকে নিযুক্ত করি। তারা বৃহস্পতিবার রওনা হয়ে যায়।

সেই রাতে 'তেরাউই' নমাজের শেষে (রমজান পর্ব্বের সময় এই নমাজ গভীর রাতে পড়া হয়। তেরাউই অর্থ বিশ্রামের স্থান। এই নমাজকে তেরাউই নমাজ বলা হয় এই কারণে যে একবার নমাজ পড়ার পর প্রার্থনাকারীরা কিছুক্ষণ

বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার নমাজ সুরু করে) রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পাঁচ ঘড়ির পর (রাত এগারোটার পর) বর্ষকালের মেঘ প্রবল বর্ষণ সুরু করে। এমন প্রবল ঝড় হঠাৎ সুরু হয় যে তাঁবুগুলির অধিকাংশই ঝড়ে উড়ে যায়। আমার শিবিরের মাঝখানে বসে লিখছিলাম। সেই সময় এমন দমকা ঝড় ওঠে যে আমার কাগজ পত্র গুছিয়ে তোলার আর সময় পেলাম না। আমার সদ্য লেখা বিচ্ছিন্ন কাগজগুলি পরদা সমেত আমার মাথার ওপরের তাঁবু উড়ে যাওয়ার সময় ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল। তাঁবুর মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু আল্লার দয়ায় আমি রক্ষা পেলাম। আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। পুঁথিপত্র ও কাগজগুলো জলে ভিজে গিয়েছিল। সেগুলো অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে পশমের কাপড়ে মুড়ে বিছানার তলায় রেখে তার ওপর একটা গালিচা ঢাকা দেওয়া হলো। দুই ঘড়ি (পৌনে এক ঘণ্টা) পর ঝড়ের বেগ কমে এলো। তোষাখানার তাঁবুটা কোনও রকমে খাড়া করে অনেক কষ্টে একটা মোমবাতি ধরিয়ে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করা হলো। ভোরের আগে আর ঘুমোতে পারিনি। রাতটা বই পত্র ও লেখার কাগজগুলো শুকোতেই কেটে যায়।

বৃহস্পতিবার (২৭মে) নদী পার হই।

শুক্রবার আমি অশ্ব পৃষ্ঠে খরিদ ও সেকেন্দারপুরের চারদিক ঘুরি। সেই দিনই আবদুল্লা ও বাকির পত্রে জানতে পারি যে শত্রুরা লক্ষ্ণৌ দখল করেছে।

শনিবার কুকিকে তার দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে বলি যাতে সে বাকির বাহিনীকে পুষ্ট করতে পারে।

রবিবার সুলতান জুনিদ বিরলাস, হাসান খলিফা ও মোল্লা আপাকের লোকদের এবং মুমিন আতকের ভাইদের যাত্রা করার জন্য আদেশ দিই যাতে তারা বাকির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার পৌঁছানোর পূর্ব্বেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সেই দিনই বৈকালিক নমাজের সময় আমার নিজের তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক এবং একটি তিপচাক অশ্ব দান করে সা' মহম্মদ মারুফকে বিদায় দিই। আগের বছরে যেমন সারণকে তীরন্দাজদের মাহিয়ানা দেওয়ার জন্য একটা অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম সেইভাবে ইসমাইল জিলওয়ানিকে সারওয়ারের রাজস্ব থেকে বাহাত্তর লক্ষ টাকা (সরযুপুর—বর্ত্তমানে গোরক্ষপুর) ভাতা এবং আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে একটি সম্মানসূচক পোষাক ও একটি তিপচাক অশ্ব উপহার দিয়ে বিদায় দিই। আলাম্বুল খান লোহানি ও তার সঙ্গের লোক-

জনকেও সারওয়ারের রাজস্ব থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তারা বিদা নেয়। স্থির হয় যে তাদের প্রত্যেকেই তাদের পুত্র এবং ছোট ভাইকে আগ্রা রেখে যাবে যাতে তারা সময়মত আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

বাঙ্গালীদের সঙ্গে এই কথা হয় যে তারা ত্রিমোহিনির দিকে দুইটি বাঙ্গলা নৌকা—গুণজাইস, ও আরাইসকে নিয়ে যাবে। যে সব নৌকা আমার হাতে ধরা পড়ে তাদের মধ্যে এই দুইখানাকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্ব্বাচিত করি। ফরমাইস ও আসাইসে শিবির ও মালপত্র বোঝাই করে সরযু নদী বেয়ে খেতে আদেশ দিই।

বেহারে এবং সারওয়ারে আমার মনোমত কাজ সমাধা করে সোমবার (৩১শে মে) চৌপাড়া চতুর্ম্মুখের ঘাটে নদী পার হয়ে সরযু নদীর উজানে নদীর তীর ধরে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হতে থাকি। দশ ক্রোশ পথচলে ফতেপুরের অন্তর্গত কালা পাহাড়ার কাছাকাছি জায়গায় শিবির ফেলা হয়। এখানে দেখলাম— সুন্দর সুন্দর উদ্যান নদী স্রোতে উর্ব্বরা এবং মনোরম সৌধ। বিশেষ করে আমগাছগুলি এবং নানা জাতের উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট পাখী আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। কয়েকদিন বিশ্রাম করার পর সেনা বাহিনীকে গাজিপুরের দিকে যাত্রা করার আদেশ দিই। ইসমাইল খাঁ জিলওয়ানি ও আলুয়াল খাঁ লোহানি তাদের দেশে যাওয়ার জন্য ছুটি চায়। ছুটির শেষে তারা আগ্রায় ফিরে আসবে বলে অঙ্গীকার করে। এক মাস পরে তাদের ছুটি দিতে সম্মত হই।

আমার সেনা বাহিনীর কয়েকজন রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফতেপুরের বড় পুকুরের ধারে যায়। নিকটেই যারা পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিয়ে আসার জন্য এক দলকে পাঠানো হয়। আর কুচেক খাজাকে সারারাত পুষ্করিনীর ধারে অপেক্ষা করে যে সব সেনা সেখানে আছে তাদের সকালে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিই।

সেখান থেকে ভোরে (১লা জুন) আমরা যাত্রা করি। যাত্রা পথের মাঝে আমি আসাইসে উঠে নদী পথে শিবিরে আসি। এই পথে সা মহম্মদ দেওয়ানার এক পুত্র আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে খলিফার পত্র দিয়ে বাকি এখানে পাঠায়। সে লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেয়। জানা যায় যে রমজান মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার (২২শে মে) শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে না। আক্রমণের সময় কিছু শুকনো ঘাস যা সংগ্রহ করা ছিল তার ওপর আতসবাজির আগুন, তার্পিন ও অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী

নিক্ষিপ্ত হলে তাতে আগুণ ধরে যায়। আগুণের তাপে দুর্গের অভ্যন্তর চুল্লীর মত গরম হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দুর্গ প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তার ফলে দুর্গের পতন হয়। দুই তিন দিন পর আমার ফিরে আসার খবর পেয়ে শত্রুপক্ষ ডাল.মৌর (উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি জেলার পূবে) দিকে যাত্রা করে। এই দিনও আমরা দশ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে সরযু নদীর তীরে সিকৃরি পরগণার জলসির গ্রামের কাছে থামি।

পশুদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বুধবারেও এখানেই অবস্থান করি। অনেকে সংবাদ আনে যে সেখ বেজিদ ও বিবন গঙ্গা নদী পার হয়ে তাদের সেনাবাহিনী চালনা করে জৌনপুর ও চুণার দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। আমিরদের আহ্বান করে একটা পরামর্শ সভা বসালাম। ঠিক হয় সুলতান জেমান মির্জ্জা ও সুলতান জুনিদ বিরলাস যারা জৌনপুরের বদলে চুণার ও অন্যান্য পরগণা পেয়েছে এবং মহম্মদ খাঁ লোহানি, কাজিজিয়া ও তাজ খাঁ সারংখানি দ্রুত এগিয়ে শত্রু পক্ষকে চুণার পৌছানোর পূর্ব্বে প্রতিরোধ করবে।

পরদিন বৃহস্পতিবার প্রত্যুষেই যাত্রা করি। সরযু নদী থেকে এগারো ক্রোশ অগ্রসর হয়ে পারসেরু নদী পার হয়ে নদীর তীরেই তাঁবু ফেলি। এখানে আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করি। পরামর্শের পর ইমান তাইমুর সুলতান, কাসিম খাজা, জাফর খাজা, খাজা জাহিদ, খাজা জান বেগ, আসকারির কর্ম্মচারীদের এবং হিন্দের আমিরদের মধ্যে আলিম খাঁ কাল্পি, মালিকদাদ কররাণি ও রসিদ সরওয়ানিকে বিবন ও বেজিদের সন্ধানে ডালমৌর দিকে যাত্রা করার জন্য নিযুক্ত করি। সৈন্য বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের নির্দ্দেশ দিই। আমি পারসেরু নদীর জলে অবগাহন করে পবিত্র হই। আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী একটা কাঠের খুটিতে কয়েকটি দীপ জ্বালিয়ে সেটা নদীর জলে নাড়তে নাড়তে কতকগুলো মাছ ধরি।

শুক্রবার (৮ঠা জুন) পারসেরু নদীর একটি শাখার তীরে শিবির ফেলি। শাখা নদীটি খুব ছোট। সৈন্য বাহিনীর নদী পারাপারের অসুবিধা লাঘব করার জন্য নদীর ওপর একটা বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দশ হাত লম্বা ও দশ হাত প্রস্থ ঘিরে একটা স্নানের জায়গা করা হয়। আমরা এইখানেই রমজান মাসের ২৭শে তারিখ (৪ঠা জুন) কাটাই।

পরদিন এই শাখা নদী ছেড়ে তুষ নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হয়।

রবিবারও এই নদীর তীরেই অবস্থান করি।

২৯শে রমজান তুষ নদীর তীরেই থাকি। আকাশ খুব পরিষ্কা'র না থাকলেও কয়েকজন নাকি চাঁদ দেখতে পায়। এই কথা যে সত্য তা তারা কাজির উপস্থিতিতেই জানায়। এতেই রমজান মাস শেষ হয়ে গেল সাব্যস্ত হলো।

পরদিন মঙ্গলবার আমরা ইদের নমাজ পড়ার পর যাত্রা আরম্ভ করি। দশ ক্রোশ অতিক্রম করে গোমতি নদীর ধারে তায়েক-এর এক ক্রোশ মধ্যে শিবির ফেলি।

মধ্যাহ্নে নমাজের কাছাকাছি সময়ে সেখ জইন মোল্লা সাহেব ও খোন্দ আমিরের সঙ্গে মোদক'খাই।' মল্ল যোদ্ধারা বৈকালে মল্লক্রীড়া দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়।

বুধবার (৯ই জুন) আমরা এখানেই থেকে যাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মোদক খাই। মালিক সারথ, যাকে তাজ খাঁকে চুর্ণার থেকে বিতাড়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল—আজ ফিরে আসে। সেদিনও মল্লক্রীড়া হয়। অযোধ্যার ওস্তাদ কিছুদিন আগেই এসেছিল। সে একজন হিন্দুস্থানি কুস্তিগিরের সঙ্গে নিপুণভাবে লড়ে তাকে ভুপাতিত করে। আমি তাকে পনরো লাখ মুদ্রণ ভাতা মঞ্জুর করে এবং একটি সম্মানসূচক পোষাক দিয়ে বিদায় দিই।

পরদিন সকালে আমরা এগারো ক্রোশ পথ চলে সেই গোমতি নদীর তীরেই নামি। এখানে শুনতে পাই সুলতান ও আমিরদের যে দলকে অভিযানে পাঠানো হয়েছে তার ডালমৌ পৌঁছেছে। তারা প্রথমে গঙ্গা পেরিয়েছে তারপর শত্রুদের অনুসরণ করে যমুনা পেরিয়ে তাদের সঙ্গে আলিম খাঁকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত শত্রুর পেছনে পেছনে অনেক ক্রোশ এগিয়েছে। তারপর যমুনা নদীর তীর ছেড়ে দিয়ে তিনবার মার্চ করার পর ডালমৌতে ফিরে এসেছে। এই দিন সেনাবাহিনীর অধিকাংশই পারাপারের একটা জায়গা ঠিক করে গঙ্গা অতিক্রম করে আসে। শিবিরের সাজ সরঞ্জাম এবং সেনা বাহিনী পার হওয়ার পর আমি কিছু ভাটিতে একটা দ্বীপে বসে মোদক খাই। যেখানে আমরা নদী পার হই, সেখানে একদিন অপেক্ষা করি। যে সব সৈন্য পথ হারিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তারা যাতে ফিরে আসতে পারে সেইজন্যই আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা। সেই দিনই বাকি তাসকেন্দি অযোধ্যা থেকে তার সেনা বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

গঙ্গা নদীর পার থেকে দুইবার মার্চ করে আমরা কোরায় (উত্তর প্রদেশের

ফতেপুর জেলার একটি সহর) কাছাকাছি এসে বিন্দ নদীর তীরে শিবিরে ফেলি। ডালমৌ থেকে কোরার দূরত্ব একুশ ক্রোশ।

বৃহস্পতিবার (১৭ই জুন) আমরা ভোরে শিবির থেকে যাত্রা করে আদমপুর পরগণার কাছে নামি। আমরা আগেই কয়েকজন মাঝিকে কাল্পিতে পাঠাই যাতে তারা শত্রুদের অনুসরণ করার জন্য সেখানে যতগুলি নৌকা পাওয়া যায় নিয়ে আসতে পারে। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি নৌকা পৌঁছে যায়। নদী পারাপারের একটা জায়গারও সন্ধান মেলে। তাঁবুগুলি অত্যন্ত ধূলিমলিন হওয়ায় আমি একটি দ্বীপেই নিদ্রা যাই। আমি এখানে কয়েক দিন দিনরাত থাকি। শত্রুপক্ষের সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি কিছু সৈন্যের সঙ্গে বাকি সাঘাওয়ালকে নদীর অপর পারে পাঠাই।

পরদিন (১৯শে জুন) জুমা নামে বাকির একজন ভৃত্য সংবাদ নিয়ে আসে যে সেখ বেজিদ ও বিবনের একটি ঘাঁটিকে তচনছ করে মুবারক খাঁ জৈওয়ানি নামে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী এবং আরও কয়েকজনকে হত্যা করেছে। কয়েক জনের মাথা কেটে ফেলে সেগুলি একজন জীবন্ত বন্দীর সঙ্গে সে আমার কাছে পাঠিয়েছে।

শনিবার সকালে খাঁ হোসেন বক্‌সি এসে পৌঁছায়। সে শত্রুপক্ষের এই পরাজয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং যে ভাবে যা ঘটেছে তার বিশেষ ব্যাখ্যা করে।

রবিবার রাত্রে যমুনা নদীতে জলস্ফীতি দেখা যায়। তার ফলে আমরা দ্বীপের যেখানে তাঁবু খাটানো হয়েছিল সেখানে থাকতে পারি না। কিছুদূরে আর একটা দ্বীপে আমাদের চলে আসতে হয়। সেখানে আর একটা তাঁবুতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়।

সোমবার (২১শে জুন) শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানকারী সুলতান ও আমিরদের কাছ থেকে জালাল তাসকেন্দি এখানে পৌঁছায়। তাদের বাম দিকের সৈন্যদের আগমনের সংবাদ পওয়া মাত্র বিবন ও সেখ বেজিদ মহোবা পরগণার (উত্তর প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটি তহশিলের প্রধান সহর) থেকে পালিয়ে যায়। বর্ষা সুরু হওয়ার এবং আমরা পাঁচ ছয় মাস নানা অভিযানে ব্যাপৃত থাকায় সৈন্যদলের অশ্ব ও অন্যান্য পশু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি সেইজন্য সুলতান ও বেগদের—যারা আমাদের আগে রওনা হয়ে গিয়েছিল—যেখানে

তারা পৌছেচে সেইখানেই অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিই—যতক্ষণ না নতু: অশ্বারোহী বাহিনী আগ্রা ও নিকটবর্ত্তী জায়গা থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সেইদিন বৈকালিক নমাজের পর আমি বাকি সাঘাওয়াল ও তার অযোধ্যা সেনাবাহিনীকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই। মারুফ ফারমুলির পু: মুসা যখন আমার সেনাবাহিনী ফেরার পথে সরযু নদী পার হয় সেই সম: আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার আনুগত্য জানিয়েছিল। তাকে আমেরহা: তহশিলের মধ্যে (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের মোরাদপুর জেলার আমরোহ তহশিলের একটি শহর) ত্রিশলাখের একটি পরগণা তার ভরণ পোষণের জন্য দান করি এবং তাকে আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে এক প্রস্থ সম্মা: সূচক পোষাক, জিনসহ একটি অশ্ব উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

এ দিকের সমস্ত কাজের বিলি ব্যবস্থা করে মঙ্গলবার রাতের চতুর্থ প্রহরের এক ঘড়ি পার হওয়ার পর (রাত সাড়ে তিনটা) আগ্রার দিকে যাত্রা করি।

পরদিন সকালে (২২শে জুন) ষোল ক্রোশ অশ্বারোহনে আসার পর মধ্যাহ্নে কালজির অন্তর্গত বলাদের পরগণায় দুপুরটা কাটাই। অশ্বগুলিকে কিছু বিশ্রাম দিয়ে সন্ধ্যে নমাজের পর পুনরায় যাত্রা সুরু করি। রাত্রে তেরো ক্রোশ পথ চলে তৃতীয় প্রহরের শেষে কালপির অন্তর্গত সুগন্ধপুর পরগণার ভাও (বাহাদুর) খাঁ সের ওয়ানির সমাধিস্থলে পৌছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। প্রত্যুষের (২৩শে জুন) নমাজ সমাধা করে আবার যাত্রা করি। ষোল ক্রোশ পথ চলার পর দুপুর নাগাদ এটোয়ায় পৌছে যাই। সেখানে মেহেদি খাজা (বাবরের শ্যালক) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে। আমি পুনরায় অশ্বারোহন করে কিছুদুর চলে রাতের প্রথম প্রহরে বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য পথেই কিছুক্ষণ থামি। তারপর ষোল ক্রোশ পথ চলে আমি আবার সকালে ফতেপুরে বিশ্রামের জন্য থামি। পুনরায় মধ্যাহ্ন কালীন নমাজের সময় যাত্রা করি। ষোল ক্রোশ এগিয়ে আসি। রাতের দ্বিতীয় প্রহরের শেষে আমি আগ্রার হেস্ত বেহেস্ত উদ্যানে পৌছিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

পরদিন শুক্রবার (২৫শে জুন) মহম্মদ বক্সি ও আরও কয়েকজন এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দুপুরের নমাজের সময় যমুনা পার হয়ে দুর্গে পৌছিয়ে বেগমদের ও পিসিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বাল্‌কের একজন অধিবাসী কিছু খরমুজের ক্ষেত করেছিল। সে আমার রন্ধনশালা সংলগ্ন উদ্যানের মালি ছিল। তাকে আমি খরমুজা উৎপাদনের জন্য আগ্রায় নিয়ে আসি।

সে কয়েকটি খরমুজা আমার কাছে নিয়ে আসে। খরমুজা খেতে খুব উপাদেয় মনে হলো। হেস্ত বেহেস্ত উদ্যানেও আমি কিছু আঙ্গুর লতার চারা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। তাতেও বেশ সুন্দর গোছা গোছা আঙ্গুর ফলেছে। সেখ গুরণ ও আমাকে এক ঝুড়ি সুস্বাদু আঙ্গুর পাঠিয়েছিল। আমি সত্যই এই ভেবে আনন্দ পেলাম যে হিন্দুস্থানে এখন খরমুজা ও আঙ্গুর ফলেছে।

শনিবার রাতের তৃতীয় প্রহরে (২৭শে জুন) মাহাম পৌঁছায়। তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ আমি সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিই। একটা অদ্ভুত সংঘটনের ব্যাপার এই যে সেই দিনই মাহাম কাবুল ত্যাগ করে।

১লা জিক্কদ (৮ই জুলাই) বৃহস্পতিবার হুমায়ুন ও মাহামের (হুমায়ুনের জননী) শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দরবার কক্ষে আমার সামনে রাখা হয়। এই দিনেই কাগপুরের দেওয়ানের একজন ভৃত্যের সঙ্গে শ'দেড়েক মাল বাহককে কাবুল থেকে খরমুজা, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল আনতে পাঠানো হয়।

৩রা তারিখে (১০ই জুলাই) হিন্দুবেগ যে কাবুল থেকে আমার পরিবার বর্গের সঙ্গে রক্ষী হিসাবে এসেছিল এবং যাকে আলি ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর সম্বলে পাঠানো হয়েছিল ফিরে আসে ও আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

হাসামউদ্দিন খলিফাও আলোয়ার থেকে পৌঁছিয়ে আমাকে সেলাম দেয়।

পরদিন রবিবার (১১ই জুলাই) আবদুল্লাও যাকে আলি ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ত্রিমোহিনি থেকে সম্বলে পাঠানো হয়েছিল—ফিরে আসে।

যে সব লোক কাবুল থেকে ফিরে এসেছে তাদের কাছে শুনতে পেলাম যে সেখ সরিফ করবাখি আব্দুল আজিজের কুপরামর্শেই হোক বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যই হোক আমাকে অত্যাচারী বলে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এবং যে সব দোষ কোনও দিন অনুষ্ঠিত হয়নি সেই সব দোষে আমাকে অপরাধী করে লাহোরের ইমামদের কাছে আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে তাতে তাদের নাম সই করতে বাধ্য করেছে এবং সেই ফতোয়ার নকল উত্তোজনা সৃষ্টির জন্য নানা জায়গায় পাঠিয়েছে। আবদুল আজিজও যে সব আদেশ এখান থেকে তার কাছে গিয়েছে সে সব অমান্য করে নানা অসঙ্গত উক্তি করেছে এবং নানা কুকাজে লিপ্ত হয়েছে। এই সব কারণে আমি কাম্বরের আলি আরঘুনকে এই ব্যাপারের বিহিত ব্যবস্থা করতে পাঠাই এবং সেখ সরিফের সঙ্গে মোকাবিলা

করার জন্য তার কাছে লাহোরের ইমামদের এবং আবদুল আজিজকে নিয়ে আসতে আদেশ দিই।

১৫ই বৃহস্পতবার (২২ শে জুলাই) সুলতান তাইমুর তাজারা থেকে এখানে পৌঁছায় ও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই দিন ওস্তাদ সাদিক ও অযোধ্যার মল্লবীরের সঙ্গে জোর কুস্তি লড়াই হয়। সাদিক অতি সহজেই অযোধ্যার মল্লবীরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই পরাজয় তাকে নিদারুণ মর্ম্মাহত করে।

১৯শে সোমবার (২৬ শে জুলাই) কিজিলবাসের দূত মুরাদ কোরচিকে একটি কটিবন্ধসহ জোব্বা দিয়ে তাকে সম্মানসূচক পোষাকে ভূষিত করে ও দুইলক্ষ তন্‌খা উপহার দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিই।

এই সময় সৈয়দ মেহেদি গোয়ালিয়র থেকে এসে জানায়—রহিমদাদেব বিদ্রোহের কথা। খলিফা, সা মহম্মদ নামে শিলমোহর বক্সী তার এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে একটি উপদেশ পূর্ণ পত্র দিয়ে রহিমদাদের কাছে পাঠায়। সা মহম্মদ রহিমদাদের কাছে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে রহিমদাদের পুত্রকে নিয়ে আসে। কিন্তু রহিমদাদ নিজে আসে না। যাহোক, রহিমদাদেব সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য জিলহজ্জ মাসের ৫ই তারিখ আমি নুরবেগকে গোয়ালিয়র পাঠাই। সে কিছুদিন পরে ফিবে এসে রহিমদাদের দাবীগুলি সম্বন্ধে জানায়। যখন আমি তার দাবীগুলি মেনে নিয়ে ফার্ম্মান পাঠাব এমন সময় রহিমদাদের একজন কর্ম্মচারী পৌঁছায়। সে জানায় যে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে রহিমদাদের পুত্রকে কোনও রকমে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। পিতার এখানে আসার কোনও রকম ইচ্ছা নাই। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমার অবিলম্বে গোয়ালিয়র যাওয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু খলিফা অনুরোধ করতে লাগলো যে সে আর একখানা চিঠি রহিমদাদকে উপদেশ দিয়ে লিখতে চায়। তার মনে হয় তার চিঠি পেয়ে রহিমদাদ শান্ত হবে ও আনুগত্য দেখাবে।

জিলহজ্জ মাসের ৭ই তারিখ, বৃহস্পতিবার মেহেদি খাজা (এটোয়ার শাসক) এটোয়া থেকে এসে পৌঁছায়। ইদের দিন আমি হিন্দুবেগকে আমার নিজস্ব তোষাখানা থেকে এক প্রস্থ সম্পূর্ণ পোষাক, একটি তরবারি, বহুমূল্য প্রস্তর খচিত কটিবন্ধ ও একটি তিপচাক অশ্ব প্রদান করি। চাঘতাই তুর্কিদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, হাসান আলিকে সম্মান সূচক পোষাক, রত্নখচিত কটিবন্ধ ও সাত লক্ষ টাকার একটি পরগণা প্রদান করি।

হিজরা ৯৩৬ সালের ঘটনাবলী

মহরম মাসের ১৩ ই তারিখ (৭ই ডিসেম্বর, ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ) সেখ মহম্মদ ঘাউস, সাহেবউদ্দিন খসরু নামে রহিমদাদের পক্ষের একজন মধ্যস্থকে নিয়ে গোয়ালিয়র থেকে আসে। (মন্তব্য-রহিমদাদ এই মহম্মদ ঘাউসের যোগাযোগেই ১৫২৬ সালে গোয়ালিয়র অধিকার করে।) লোকটি (মহম্মদ ঘাউস) সৎ ও সাধু প্রকৃতির। তারই জন্য রহিমদাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করি। সেখ গুরণ ও নুরবেগকে গোয়ালিয়রের অধিকার নিতে পাঠাই।

পরিশিষ্ট

হিজরা ৯৩৬ সালের প্রথম থেকেই বাবরের আত্মজীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরের কোনও সময়েরই লেখার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর জীবনের শেষ পনরো মাসের কোনও আত্মজীবনী লিখেছিলেন কিনা তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি বা সন্ধান মেলেনি। স্বাস্থ্যের অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় তাঁর স্বভাবজাত কর্ম্মপ্রেরণা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাঁর রাজত্বের শেষ কয়েক মাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরাও নীরব। সুতরাং এই ধারণা স্বতঃই মনে ওঠে যে এই সময়ের কোনও কথাই আর লেখা হয়নি। যদি বা হয়েও থাকে তা লোক চক্ষুর অগোচরেই থেকে গেছে।

হুমায়ুন সুদীর্ঘ নয় বছরের অধিকাংশ সময় (১৫১৯ থেকে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সুদূর বাদাকসান থেকে সেখানকার সরকার পরিচালনা করছিলেন। তিনিও ৯৩৬ হিজরি সনে সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছে থাকার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন সম্ভবতঃ পিতার ভগ্নস্বাস্থ্যের সংবাদ শুনে। তিনি হঠাৎ বাদাকসানের শাসন ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই শাসনভার সুলতান উইসের ওপর ন্যস্ত করে কাবুলের পথে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করেন। কাবুলে তাঁর ভ্রাতা কামরাণের সঙ্গে পরামর্শ করে আগ্রার পথে রওনা হন। কামরাণ ঠিক সেই সময়েই কান্দাহার থেকে কাবুলে পৌঁছেছিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কামরাণকে তার শৈশবাবস্থাতেই কাবুল ও কান্দাহারের সাধারণ ভার দিয়েছিলেন।

হুমায়ুন বাদাকসান ছেড়ে চলে আসার পরেই কাসঘরের সৈয়দ খাঁ সুলতান উইস্ ও দেশে উপস্থিত অন্যান্য আমিরদের আমন্ত্রনে রসিদ খাঁকে ইয়ারকন্দে রেখে বাদাকসানের দিকে অভিযান করে। বাবরের কনিষ্ঠ পুত্র দশবৎসর বয়স্ক হিন্দাল সেই সময় আগ্রায় ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর স্থলে বাদাকসানের ভার নেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হন। হিন্দাল সৈয়দখাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে জাফর দুর্গে অবস্থান করে দুর্গ

রক্ষার জন্য এমন তেজের সঙ্গে চেষ্টা করতে থাকেন যে সৈয়দখাঁ উপায়ান্তর না দেখে দুর্গ-অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে বাবরের কাছে সংবাদ এসে গেছে যে সৈয়দ খাঁ সমস্ত বাদাকসান রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে। এই অশুভ সংবাদ অনবরত ঐদিক থেকে আসতে থাকায় বাবরের মনের ওপর আঘাত হানতে থাকে। তাতে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী খলিফাকে বাদাকসান উদ্ধার করার জন্য নির্দেশ পাঠান। কিন্তু সেই আমির নানা অজুহাত দেখিয়ে এই নির্দেশ পালন করেন না। সম্ভবতঃ খলিফার এই ধারণা হয়েছিল যে বাদাকসান যাত্র র আদেশ হুমায়ুনের জননীর পরামর্শ মতই বাবর দিয়েছেন। বাবরের ওপর তাঁর এই স্ত্রীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তিনিই তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শক্তিধর শত্রু খলিফাকে এই সময় দূরে পাঠিয়ে দিতে চান—এই ধারণাই খলিফার হয়েছিল।

অনুরূপ আদেশ বাবর পুত্র হুমায়ুনকেও দেন—কারণ বাদাকসানের শাসনভার হুমায়ুনের ওপরই দিল। কিন্তু হুমায়ুনও যেতে অস্বীকার করেন এই অজুহাতে যে তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এতই বেশী যে তিনি এই সময় পিতার কাছ থেকে অতদূরে কিছুতেই যেতে পারেন না। তারপর বাবর সুলতান উইসের জামাতা এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই ষোল বছরের সুলেমানকে ঐ দেশের শাসনভার দিয়ে পাঠান। সুলেমানের পিতা খান মির্জাও বাদাকসানের শাসক ছিলেন। সুলেমানের সঙ্গেই সৈয়দ খাঁর নামে বাবর চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়ে দেন যে তার এই বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

কাবুল পৌঁছানোর পূর্বেই সুলেমান সৈয়দ খাঁর পিছিয়ে আসার সংবাদ পায়। তবুও সে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়ে হিন্দলের কাছ থেকে বাদাকসানের ভার গ্রহণ করে। তারপর, হিন্দল হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করে। বাবরের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তারই সুযোগে সুলেমান বাদাকসানের অধিকার বজায় রাখে। তার বংশধররাও অনেকদিন এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করে।

হুমায়ুন কোনও নির্দেশ ছাড়াই অযাচিত ও অপ্রত্যাসিত ভাবে আগ্রায় এসে পৌঁছান। তাঁর প্রতি পিতার অসীম স্নেহ এবং তাঁর মাতার পিতার ওপর প্রবল প্রভাবের জন্য তিনি ভাল অভ্যর্থনাই পান পিতার কাছ থেকে। তাঁর অপরাধ ভুলে যাওয়া হলো। কিছুদিন দরবারে থাকার পর তাঁর ভারপ্রাপ্ত সম্বল সরকারে চলে যান। সেখানে প্রায় ছয়মাস থাকার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ বাবরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তিনি তাঁকে

নৌকাপথে আগ্রায় আনার জন্য আদেশ দেন। তিনি আগ্রায় পৌঁছান বটে কিন্তু তাঁর জীবনের কোনও আশা ছিল না। যখন নানা রকমের চিকিৎসায়ও কোনও ফল হলো না এবং যখন নানা জ্ঞানী ব্যক্তি সম্রাটের কাছে তাঁর পুত্রের এই নিদারুণ দুঃখজনক পীড়া সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন সেই সময় আবুলবাক নামে একজন মহান ব্যক্তি—যাঁকে সাধুতার জন্য সকলেই শ্রদ্ধা করে—বাবরকে বলেন যে এই রকম অসহনীয় অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লা কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে তাঁর সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ তাঁকে অর্পণ করার শফৎ নিলে তার বিনিময়ে একজন মুমূর্ষু প্রাণ পেতে পারে। বাবর বলেন যে তাঁর জীবন হুমায়ুনের সব চেয়ে প্রিয় এবং হুমায়ুনের জীবনও তাঁর কাছে সব কিছুর ওপরে। হুমায়ুনের প্রাণের পর তাঁর জীবনের মূল্য বেশী। সুতরাং তাঁর জীবনই আল্লার উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। তাঁকে ঘিরে যে সব আমিররা ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁকে এই কঠোর শফতের কথা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তাঁরা বল্লেন—তাঁর এই প্রথম শফৎ পরিবর্তন করে যে বহুমূল্য হীরক আগ্রায় আছে সেইটি আল্লার নামে উৎসর্গ করুন, কারণ সেই হীরক পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল রইলেন। বল্লেন—কোনও হীরক যতই মূল্যবান হোক তার সঙ্গে তাঁর জীবনের মূল্যের তুলনা হয় না। তিনি তিনবার মরনোন্মুখ পুত্রের শয্যা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সেখান থেকে চলে এসে আন্তরিক ভাবে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চীৎকার করে উঠলেন—পুত্রের পীড়া আমি টেনে নিয়েছি। মুসলমান ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন যে সেই সময় থেকে হুমায়ুন ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। বাবরের সেই অনুপাতে স্বাস্থ্য ও শক্তি ক্রমশঃ হীন হয়ে আসতে লাগলো। বাবর তাঁর মৃত্যু কালীন উপদেশ জানিয়ে দিলেন—খাজা খলিফা, কামবার আলি বেগ ও তারদি বেগকে। তাঁরা যেন হুমায়ুনকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করেন। পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা যা তিনি তাঁর জীবনব্যাপি দেখিয়ে এসেছেন তারই প্রেরণায় তিনি হুমায়ুনকে তাঁর ভাইদের প্রতি সদয় থাকার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। হুমায়ুন তাঁর কথা মেনে চলবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। যা এ রকম অবস্থায় কদাচিৎ ঘটে থাকে তিনি সত্যই সে শফৎ পালন করেছেন। আর তাঁর আমিরদের কাছে তাঁর অনুরোধ তাঁরা শুনলেন বটে কিন্তু সচরাচর যা ঘটে থাকে তাই হলো। বাবরের মৃত্যুতে তাঁরা বিভেদমূলক পরিস্থিতিই তৈরী করেন। খাজা খলিফা হুমায়ুনকে অত্যন্ত অপছন্দ

করতেন—যার কারণ কিছুই জানা যায় না মৃত্যুপথ যাত্রী সম্রাটের দরবার ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ালো।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খলিফার—যাঁর উপাধি ছিল নিজাম উদ্দিন আলি খলিফা তুর্কির আমিরদের ওপর প্রভূত প্রভাব ও অসীম কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে বাবরের কোনও পুত্রই তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। তিনি বাবরের আত্মীয় মেহদি খাজাকে বাবরের উত্তরাধিকারী করার সাব্যস্ত করেন। মেহেদি খাজা খুবই সাহসী কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ও গোঁয়ার যুবক। খলিফার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের জানা শোনা। যখন এই কথা প্রকাশ পেলো যে খলিফা তাঁর নিজের স্বার্থেই তাকে সিংহাসনে বসানোর সংকল্প করেছে তখন সেনা বাহিনীর প্রধানেরা তার উত্তরাধিকারিত্ব একেবারে পাকা মনে করে মেহেদি খাজাকে সম্মান দেখাতে বিলম্ব করলো না। মেহেদি খাজাও তার হাব ভাবে সেই যে রাজতক্তে বসতে পারে এমন আচারণই দেখাতে স্বরু করলো। যখন সব কিছুই ঠিক যে সেই হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে এমন সময় খলিফা সহসা আদেশ দিল যে তাকে তার নিজের বাড়িতে প্রহরাধীনে থাকতে হবে।

এই রকম নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে—যা বোধহয় বাবরের অজ্ঞাত ছিল—তিনি আগ্রার সন্নিকটে চারবাগে মারা যান—৯৩৭ হিজরা সনের প্রথম জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) যখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ।

বাবর তাঁর মৃত্যু কালে সাতটি সন্তান রেখে যান—চারটি পুত্র, তিনটি কন্যা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন তাঁর স্থলে সমগ্র রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন। হুমায়ুন তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরাণকে তাঁর পূর্বের ভার প্রাপ্ত কাবুল ও কান্দাহারের সঙ্গে পাঞ্জাবের শাসন ভার দেন। হিন্দাল মির্জ্জাকে যিনি সবেমাত্র বাদাকসান থেকে এসে পৌঁছেছেন মেওয়াতের এবং আসকারিকে সম্বলের শাসন ভার দেন। পরবর্ত্তী রাজত্বকালে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাতে প্রত্যেক সম্রাট পুত্রই বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

বাবরের তিন কন্যা গুল রং বেগম, গুলচেরে বেগম ও গুল বদন বেগম একই মায়ের সন্তান।

শেষ